

বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

অনুসন্ধানী
পাঠ



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিচক্ষণ নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে পাওয়া জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ' পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ' পদকে ভূষিত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরিবেশ আদালত আইন, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সংবিধানে ১৮-ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, বাংলাদেশ জীব-বৈচিত্র্য আইন প্রণয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তহবিল গঠন এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ২০১৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী
প্রণীত এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বিজ্ঞান

অনুসন্ধানী পাঠ

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

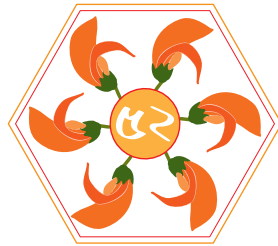
রচনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. হাসিনা খান
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান
ড. মুশতাক ইবনে আযুব
রনি বসাক

নাসরীন সুলতানা মিতু
ড. মানস কান্তি বিশ্বাস
শিহাব শাহরিয়ার নির্ঝর
মোঃ রোকনুজ্জামান শিকদার
ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

নাসরীন সুলতানা মিতু

চিত্রণ

সব্যসাচী চাকমা

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন

নাসরীন সুলতানা মিতু



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর ও জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা



অধ্যায় ১: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ০১



অধ্যায় ২: পৃথিবী ও মহাবিশ্ব ১৫



অধ্যায় ৩: গতি ২৭



অধ্যায় ৪: পদার্থ ও তার বৈশিষ্ট্য ৩৪



অধ্যায় ৫: জীবজগৎ ৪৩



অধ্যায় ৬: উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব ৫৩



অধ্যায় ৭: আবহাওয়া ও জলবায়ু ৬৬



অধ্যায় ৮: পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং এর বাহ্যিক প্রভাব ... ৭৮

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা



অধ্যায় ৯: বল ও শক্তি ৮৮



অধ্যায় ১০: মানব শরীর ১০১



অধ্যায় ১১: আলো ১১৪



অধ্যায় ১২: জীবের পুষ্টি ও বিপাক ১২৪



অধ্যায় ১৩: সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন ও তাদের আপেক্ষিক অবস্থান ... ১৩০



অধ্যায় ১৪: জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং টেকসই পরিবেশ .. ১৪১

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই? ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ে তোমাদের স্বাগতম!

দেখতেই পাচ্ছ, এতদিন তোমরা যেভাবে পড়াশোনা করে এসেছ, তাতে একটা বড়ো পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে! তোমাদের সকল বিষয়ের বইগুলোও তাই এবার একটু অন্যরকম। বিজ্ঞান বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই দুইটি বই হাতে পেয়েছ! এই ‘অনুসন্ধানী পাঠ’ বইটির সঙ্গে তোমাদের আরেকটা ‘অনুশীলন বই’ও দেওয়া হয়েছে। একটু চোখ বোলালেই বুঝতে পারবে যে, এই বইটির সঙ্গে অনুশীলন বইটির বড়ো ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সত্যি বলতে এতদিন যেভাবে তোমরা পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে বিজ্ঞান শিখতে চেষ্টা করেছ, এবার এই শেখার ধরনটাই একেবারে বদলে যাচ্ছে। পুরো বছর জুড়ে তোমরা বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে, নতুন নতুন কিছু সমস্যার সমাধান করবে। এই নতুন অভিজ্ঞতাগুলো আর সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো সব বিস্তারিতভাবে তোমাদের অনুশীলন বইটিতে দেওয়া আছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গিয়ে নানা ধাপে তোমাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জানার প্রয়োজন পড়বে, সেজন্য তোমাদের সাহায্য করবে এই ‘অনুসন্ধানী পাঠ’ বই। স্কুলে বা বাড়িতে, যখন যেখানেই থাকো, তোমরা এই বইটির সাহায্য নিয়ে দরকার হলে নিজে নিজেই সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলতে পারবে!

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমাদের বিজ্ঞানের যেসব বিষয় জানার প্রয়োজন হবে সেগুলো এই বইয়ে মোট ষোলটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। পুরো বছর জুড়ে তোমরা যে অভিজ্ঞতাগুলোর ভেতর দিয়ে যাবে, তাতে এই বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে তোমাদের কাজে আসবে।

তাহলে শুরু করা যাক, কী বলো?



অধ্যায় ১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

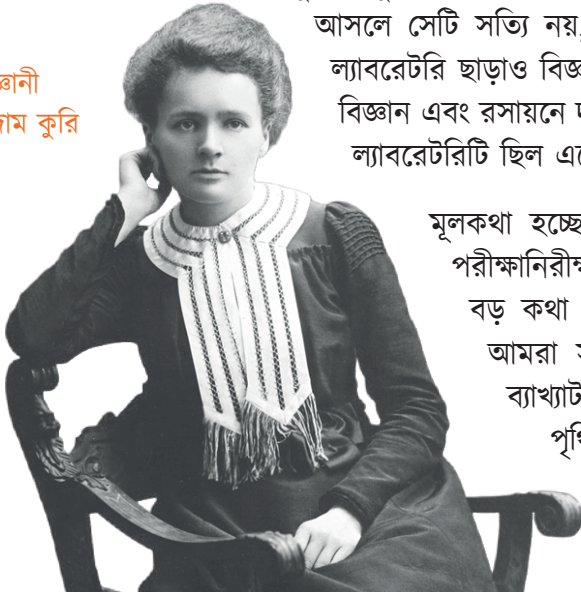
এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ✓ বিজ্ঞানের ধারণা, প্রযুক্তির ধারণা
- ✓ বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তি
- ✓ ভালো প্রযুক্তি, খারাপ প্রযুক্তি
- ✓ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া
- ✓ বিভিন্ন রাশির পরিমাপ, বিভিন্ন ধরনের পরিমাপের পদ্ধতি
- ✓ ছোট ও বড় স্কেলে পরিমাপ
- ✓ প্রয়োজনে নিখুঁত পরিমাপ
- ✓ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা
- ✓ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা
- ✓ বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি

১.১ বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের কথা বলতেই আমাদের কল্পনায় বড় বড় আধুনিক ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের জটিল সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন, এরকম একটা ছবি ভেসে ওঠে। সেজন্য অনেকেই মনে করে বিজ্ঞানচর্চা বুঝি সবাই করতে পারে না, এর জন্য বুঝি অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকতে হয়, বিজ্ঞানী হতে হলে অনেক মেধাবী হতে হয়।

বিজ্ঞানী
মাদাম কুরি



আসলে সেটি সত্যি নয়, বিজ্ঞান সবার জন্য। অনেক বড় আধুনিক ল্যাবরেটরি ছাড়াও বিজ্ঞানের গবেষণা করা যায়। মাদাম কুরি পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নে দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ল্যাবরেটরিটি ছিল একেবারেই সাদামাটা।

মূলকথা হচ্ছে বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান যেটি সবসময় পরীক্ষানিরীক্ষা করে যাচাই করা যায়। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা বিজ্ঞান হচ্ছে চিন্তার একটা পদ্ধতি যেখানে আমরা সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করি এবং সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যাটাকেও যাচাই করে দেখি সেটি সত্যি কি না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর তত্ত্ব নিয়েও আমরা প্রশ্ন করতে পারি এবং সেটি সত্যি কি না

পরীক্ষা করে দেখতে পারি। হাজার হাজার বছর থেকে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকে প্রতিনিয়ত যাচাই করে আসা হচ্ছে বলে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর কোনটা কতটুকু সত্যি সেটা আমরা জানি। যখন প্রয়োজন হয় তখন বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আমরা পরিবর্তন করি, কিংবা পরিমার্জন করি। সেজন্য বিজ্ঞানের উপর আমরা সবসময় নির্ভর করতে পারি।

বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান যেটি যুক্তিতর্ক, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষা দিয়ে যাচাই করতে পারি, কিন্তু মনে রাখবে যে, সব ধরনের জ্ঞানই কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নয়। আমাদের চারপাশে যে বাস্তব জগৎ আছে, সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। তাই ভালোবাসা, হিংসা বা নৈতিকতার মতো বিষয়গুলো নিয়ে যে জ্ঞানটুকু গড়ে উঠছে সেটি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ঘটনা হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র।

১.১.১ দুজন বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান বিষয়টা সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবারে দুজন বিজ্ঞানীর দুটি আবিষ্কারের কথা বলা যাক। একজন বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীর সবাই জানে আর অন্যজনকে দেখলে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে তিনি একজন বিজ্ঞানী, তার কথা জানে শুধু আমাদের দেশের অল্প কিছু মানুষ।



স্যার আইজাক নিউটন

স্যার আইজাক নিউটনের কথা কে না জানে, বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার রয়েছে কিন্তু এখানে তুলনামূলকভাবে একটি সহজ আবিষ্কারের কথা বলা যাক। তিনি বলেছিলেন, সূর্যের আলোকে আপাতত রংহীন মনে হলেও এটি আসলে অনেকগুলো রং দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানী নিউটন যে সময়ে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন সেই সময়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সেরকম প্রচলন হয়নি। একজন বিজ্ঞানী কোনো তত্ত্ব দিলে সবাই মিলে সেটা নিয়ে আলোচনা করে বের করার চেষ্টা করতেন তত্ত্বটি সঠিক না ভুল।

বিজ্ঞানী নিউটন শুধু তাঁর তত্ত্ব দিলেন না, একটি প্রিজম দিয়ে সূর্যের আলোকে ভাগ করে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তিনি এটি করেই থেমে গেলেন না, আরেকটি প্রিজম দিয়ে সাতটি রংকে একত্র করে আবার বর্ণহীন করে দেখালেন!

পরীক্ষা করে একেবারে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেখানোর ফলে বিজ্ঞানী নিউটনের তত্ত্বটি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

হরিপদ কাপালী



হরিপদ কাপালী ছিলেন ঝিনাইদহ এলাকার একজন সাধারণ চাষি। তিনি তাঁর ক্ষেতে হরি ধান লাগিয়েছেন, সেই ক্ষেতের ধান পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ করে দেখলেন, কিছু গাছ তুলনামূলকভাবে বড় এবং সেখানে ধানের ফলন হয়েছে বেশি। হরিপদ কাপালী একজন কৃষক হলেও তিনি আসলে বিজ্ঞানী, তাই সেই ধানগুলো অন্য ধানের সাথে মিশিয়ে না ফেলে সেগুলো আলাদা করে ফেললেন। তার বীজকে আলাদা করে করে সেগুলো আবার নতুন করে লাগালেন, তিনি দেখতে চাইলেন আসলেও সেগুলো উচ্চ ফলনশীল কিনা। দেখা গেলো সেগুলো বেশ বড় হলো এবং অনেক বেশি ধানের ফলন হলো।

খাঁটি বিজ্ঞানীরা স্বার্থপর হন না, তাঁরা সবার জন্য কাজ করেন। হরিপদ কাপালীও তাঁর ধানের বীজ অন্যদের বপন করতে দিলেন এবং দেখতে দেখতে সেই এলাকার সকল চাষি উচ্চ ফলনশীল ধান পেতে লাগল!

বিজ্ঞানী হরিপদ কাপালীর এই আবিষ্কারের কথা লোকমুখে অন্যান্য জেনে যাওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করে। তাঁর ধানের নাম দেওয়া হয় হরি ধান, দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁকে পদক দিয়ে সম্মানিত করে এবং পাঠ্যবইতে তাঁর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা লেখা হয়।

তোমাদের এই দুজন বিজ্ঞানীর কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে বোঝানোর জন্য যে, বিজ্ঞান আসলে শুধু বড় বড় ল্যাবরেটরি এবং দক্ষ অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের জন্য নয়। একজন সাধারণ মানুষের যদি অনুসন্ধিৎসু মন থাকে তাহলে তিনিও বিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারেন।

১.২ প্রযুক্তি

বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু যখন আমাদের জীবনের কোনো একটি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে বলে প্রযুক্তি। যেমন বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, পদার্থের ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার শক্তিকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় এবং এই বিদ্যুৎ আমাদের জীবনের অনেক প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের রূপপুরে সেরকম একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। আবার সেই একই জ্ঞান ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে দুবার সেটি সরাসরি মানুষের উপর ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞানের অপূর্ব একটি জ্ঞানকে

প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের ভালো কাজে যেরকম ব্যবহার করা যায়, ঠিক সেরকম মানুষকে ধ্বংস করার কাজেও ব্যবহার করা যায়।

বিজ্ঞান যেহেতু একটা জ্ঞান এবং চিন্তার একটা প্রক্রিয়া তাই বিজ্ঞানের মাঝে খারাপ কিছু থাকার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে যখনই কোনো একটা প্রযুক্তি গড়ে তোলা হয় সেটি কিন্তু যেরকম ভালো হতে পারে ঠিক সেরকম খারাপও হতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে তোমাদের সেরকম একটা উদাহরণ দিয়েছি, সেটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং নিউক্লিয়ার বোমা। ঠিক সেরকম জৈবরসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য ওষুধ তৈরি করা হয়, আবার সেই একই জ্ঞান ব্যবহার করে ভয়ানক মাদক তৈরি করা হয়, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধের উৎস।



নিউক্লিয়ার শক্তি ভালো, খারাপ
দুইরকম কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে

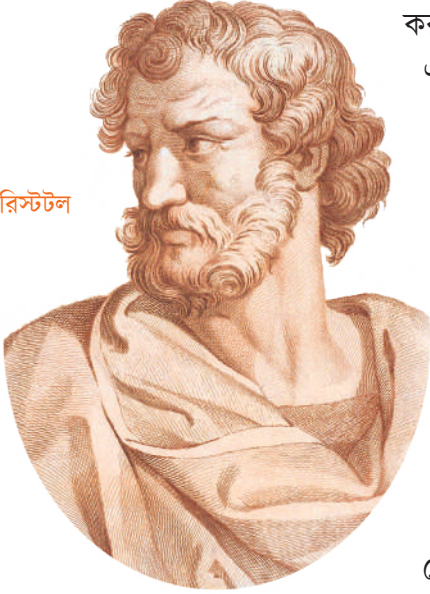
আমরা শুরুতে বলেছি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে প্রযুক্তি বলি, যদি তোমরা তোমাদের চোখ কান খোলা রাখো তাহলে দেখবে মাঝে মাঝে সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমাদের লাভ থেকে ক্ষতি বেশি হয়। যেমন পলিথিনের ব্যাগ—আমরা এই ব্যাগগুলো একবার ব্যবহার করে ফেলে দিই। এগুলো অপচনশীল বলে আবর্জনার সাথে সাথে শেষ পর্যন্ত নদীর তলদেশ বা প্রকৃতিতে আশ্রয় নেয়, প্রথমে দেশের তারপরে পৃথিবীর পরিবেশের মহাবিপর্ষয় ঘটতে থাকে। কিন্তু মানুষ যদি এর বদলে কাপড়ের বা চটের ব্যাগ ব্যবহার করতো তাহলে কিন্তু এই সর্বনাশ হতো না। কাজেই তোমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে একবার ব্যবহারের উপযোগী পলিথিনের ব্যাগের এই প্রযুক্তিটি আসলে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি।

আবার কিছু অসাধারণ চমৎকার প্রযুক্তি রয়েছে যেগুলো আমাদের জীবনযাত্রার মানের অনেক বড় পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু সেই একই প্রযুক্তি একজন মানুষ অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এমনকি ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহার করতে পারে। তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ তোমাদের সবার চোখের সামনেই রয়েছে, সেটি হচ্ছে স্মার্টফোন। স্মার্টফোন কত কাজে লাগে সেটা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না কিন্তু মাঝে মাঝে দেখবে কোনো একজন মানুষ সম্পূর্ণ বিনা কারণে সেটি ব্যবহার করে নিজের সময় নষ্ট করছে। অপ্রয়োজনে ব্যবহার করে করে অনেক তরুণ-তরুণী নিজেদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ যে প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি হয়েছে, সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই মানুষের অকল্যাণ করা যায়, ক্ষতি করা যায়।

তাই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়। বিজ্ঞান কখনো খারাপ হতে পারে না, কিন্তু প্রযুক্তি যদিও মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখেই তৈরি হয় কিন্তু সেটি ভালো হওয়ার পাশাপাশি খারাপও হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় হতে পারে কিংবা তার অপব্যবহারও হতে পারে। কাজেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার আগে সবসময়ই এই ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

১.৩ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

এরিস্টটল



এরিস্টটল তাঁর সময়ের অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়কার জ্ঞানী ব্যক্তির শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সবকিছুই চর্চা করতেন। তাই এরিস্টটলের বিজ্ঞান নিয়েও অনেক তত্ত্ব ছিল। একটি তত্ত্ব ছিল ভারি আর হালকা বস্তু নিয়ে। এরিস্টটল বলেছিলেন ভারি আর হালকা বস্তু উপর থেকে ছেড়ে দিলে ভারী বস্তুটি আগে নিচে পড়বে। সেই সময় জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথাকে সবাই গুরুত্ব দিত তাই দুই হাজার বছর ধরে সবাই বিশ্বাস করত সেটাই সত্যি।

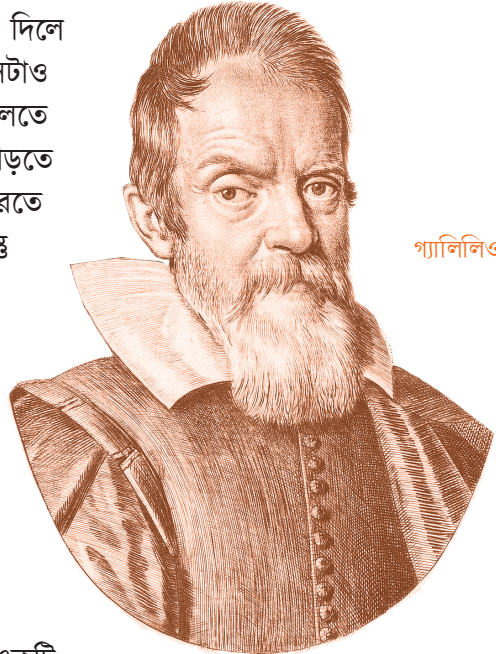
বিষয়টা একটু চিন্তা করলেই কিন্তু খটকা লাগে। যদি ভারি জিনিস দ্রুত এবং হালকা জিনিস ধীরে নিচে পড়ে তাহলে দুটি একসাথে বেঁধে দিলে হালকা জিনিসটা ভারি জিনিসটাকে আর দ্রুত পড়তে দেবে না। আবার দুটি জিনিস একসাথে বেঁধে দিলে মোট ওজন আরও বেশি বলে সেটার আরও দ্রুত পড়া উচিত। তাহলে কোনটা সত্যি? এই প্রশ্নের উত্তর কী?

যুক্তিতর্ক দিয়ে আমরা একটা উত্তর দাঁড় করতে পারি, যে আসলে ভারি আর হালকা সব বস্তুই একসাথে

নিচে পড়বে। কিন্তু আমরা তো সেটা ঘটতে দেখি না—একটা পাথর আর এক টুকরা কাগজ উপর থেকে ছেড়ে দিলে সবসময়ই পাথরটাই আগে নিচে পড়ে। আমরা সেটাও ব্যাখ্যা করার জন্য একটা যুক্তি দাঁড় করতে পারি—বলতে পারি বাতাসের বাধার কারণে কাগজের টুকরার পড়তে সময় বেশি লাগে। বায়ুশূন্য জায়গায় পরীক্ষাটা করতে পারলে দেখব দুটো একই সময় নিচে পড়ছে। কিন্তু বায়ুশূন্য জায়গা পাওয়া খুব সহজ নয়, তাই ভারি বস্তুর সাথে খুবই ছোট আকারের হালকা একটা বস্তু নিতে পারি যেন বাতাসের বাধা বেশি না হয়। কথিত আছে পিসার হেলানো দালানের উপর থেকে এরকম একটি ভারি আরেকটি হালকা বস্তু ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন যে, ভারি এবং হালকা বস্তু একসাথে নিচে পড়ে।

উপরের উদাহরণটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি

গ্যালিলিও



সুন্দর উদাহরণ। এখনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিটা একই আছে। এখানে মোট ছয়টি ধাপ রয়েছে, ধাপগুলো এরকম:

১। একটি প্রশ্ন যার উত্তর বের করতে হবে।

(উপরের উদাহরণে সেই প্রশ্নটি হচ্ছে ভারি না হালকা বস্তু কোনটা আগে নিচে পড়বে?)

২। এ সম্পর্কে যা কিছু গবেষণা হয়েছে তা জেনে নেওয়া।

(উপরের উদাহরণে সেটি ছিল এরিস্টটলের ব্যাখ্যা।)

৩। প্রশ্নটির একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো।

(উপরের উদাহরণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে ভারি এবং হালকা দুটিই বস্তুই একসাথে নিচে পড়বে।)

৪। সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি সত্যি কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা।

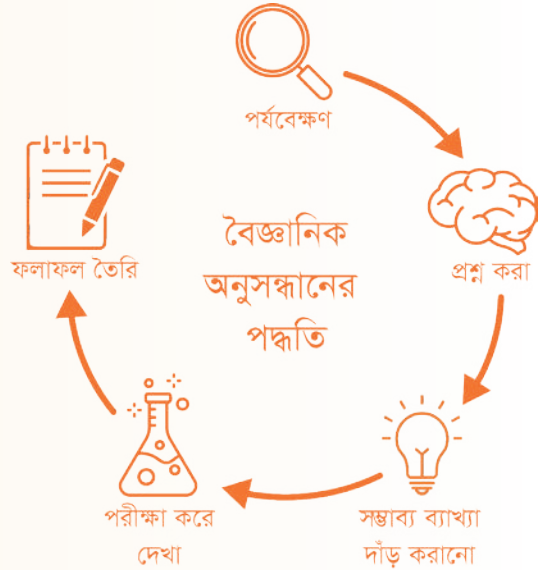
(উপরের উদাহরণে গ্যালিলিও সেটি পিসার হেলানো দালানের উপর থেকে ভারি এবং হালকা বস্তু ফেলে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন।)

৫। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া।

(উপরের উদাহরণে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁর ধারণা সঠিক।)

৬। সবাইকে ধারণাটি জানিয়ে দেওয়া।

(গ্যালিলিও তার ধারণাটি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তখন অন্যরাও পরীক্ষাটি করে দেখেছিলেন।)



তোমরা যদি ইতিহাসের বড় বড় বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো দেখো তাহলে দেখবে, সবসময়ই সেগুলো ঘটেছে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে। আবার তোমাদের চারপাশের দৈনন্দিন ঘটনাগুলোর জন্যও কিন্তু এটা সত্যি, তোমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর এভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেই পেয়ে যাবে।

মূলকথা হচ্ছে, বিষয়টা যদি বিজ্ঞানের বিষয় হয় তাহলে তার উত্তরটি চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়া নয়; সেটি যাচাই করে গ্রহণ করা হচ্ছে বিজ্ঞান। সবাই হয়ত বিজ্ঞানী হবে না কিন্তু সবাই বিজ্ঞানমনস্ক হবে।

১.৪ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ

তোমরা এর মাঝে জেনে গেছো যে বিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি জ্ঞান যার ক্ষেত্র হচ্ছে প্রকৃতি কিংবা প্রাকৃতিক ঘটনা এবং বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব সত্যি কিনা সেটি যখন খুশি যাচাই করে দেখা যায়। এটি যাচাই করার জন্য যে পদ্ধতিটি সবচেয়ে কার্যকর সেটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ। যখনই কোন একজন বিজ্ঞানী একটি বিজ্ঞানের তত্ত্ব দেন তখন সাথে সাথে অন্য বিজ্ঞানীরা সেই তত্ত্বটি সত্যি কিনা সেটা যাচাই করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেন। তোমরা ল্যাবরেটরিতে যে অসংখ্য যন্ত্রপাতি দেখো তার সবই এরকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সেজন্য সবসময়ই বলা হয়ে থাকে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান কখনও একা একা অগ্রসর হতে পারে না, এ দুটো সবসময় একে অন্যের হাত ধরে মূল বিজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আবার মহাকাশ বিজ্ঞান কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্র আছে যেগুলো সরাসরি ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ করে দেখা সম্ভব নয়, তখন বিজ্ঞানীরা শুধু পর্যবেক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন। সেই পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেক সূক্ষ্ম কিংবা জটিল যন্ত্র তৈরি করে সেগুলো ব্যবহার করে অনেক কিছু পরিমাপ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণই হোক আর পর্যবেক্ষণই হোক সেগুলো সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য আমাদের অনেকগুলি রাশিকে সুনির্দিষ্ট করে নিতে হয়েছে, পরের পরিচ্ছেদে তোমাদেরকে সেরকম কয়েকটি রাশির এককের কথা বলা হয়েছে।

১.৪.১ বিভিন্ন রাশির পরিমাপ

একটা পাথর উপরে ছুড়ে দিলে একসময় তা আবার নিচে এসে পড়ে। মানুষ প্রাচীনকাল থেকে এটা দেখে আসছে। কিন্তু এই জ্ঞানটুকু পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বলতে পারবে না যে—ঠিক কত জোরে কত ওজনের একটা পাথর কোন দিকে ছুড়ে দিলে কত সময়ে কত উপরে উঠে তা কত দূরে গিয়ে পড়বে। তার অর্থ প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা করতে গেলে আমাদের সবকিছু পরিমাপ করে বলতে হয়।

যে সমস্ত বিষয় আমরা পরিমাপ করতে পারি সেগুলোকে রাশি বলে। কাজেই জ্বর ওঠার পর তোমার যে তাপমাত্রা বেড়ে যায় সেটি হচ্ছে একটা রাশি, কিন্তু জ্বর ওঠার কারণে তোমার শরীরে যে খারাপ অনুভূতি হয় সেটি রাশি নয়। ঠিক সেরকম একটা রসগোল্লা ভর হচ্ছে রাশি, কিন্তু রসগোল্লা খাওয়ার আনন্দ রাশি নয়। কাজেই তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে, বিজ্ঞানচর্চা করতে হলে আমাদের অনেক রাশি পরিমাপ করতে হবে। রাশিগুলো পরিমাপ করার জন্য আমাদের সঠিক একক তৈরি করে নিতে হবে, যেমন দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার, সেন্টিমিটার বা কিলোমিটার; ভরের জন্য কেজি কিংবা পাউন্ড ইত্যাদি। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে রাশি কতগুলো আছে? তাদের জন্য কতগুলো একক লাগবে? আমরা যদি কিছু রাশির কথা কল্পনা করতে চাই, তাহলে এক নিশ্বাসে বলে দিতে পারব দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন, ওজন, ঘনত্ব, অবস্থান, বেগ, চাপ, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা, রং, কাঠিন্য—অর্থাৎ রাশির কোনো শেষ নেই। সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের একক কয়টি লাগবে?

আনন্দের কথা হচ্ছে আমাদের চারপাশের জগতে অসংখ্য রাশি থাকলেও সেগুলো ব্যাখ্যা করতে মাত্র সাতটি রাশির জন্য সাতটি একক তৈরি করে নিলে সেগুলোকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের সব রাশি তৈরি করে ফেলতে পারব। সেই সাতটি রাশির চারটি তোমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন ব্যবহার করো, সেগুলো হচ্ছে দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এবং তাপমাত্রা। (অন্য তিনটি হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ, পদার্থের পরিমাপ, আলোর গুণ্জ্বল্য, আরেকটু উপরের ক্লাসে তোমরা সেগুলো সম্পর্কেও জানবে।) পরিমাপের জন্য এককগুলো আন্তর্জাতিকভাবে সবাই মিলে ঠিক করে রেখেছে। যদিও বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন একক প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত SI ইউনিটগুলো এরকম: দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার (m), ভরের জন্য কিলোগ্রাম বা কেজি (kg), সময়ের জন্য সেকেন্ড (s), তাপমাত্রার জন্য কেলভিন (K)। আমরা এবারে প্রচলিত এই চারটি এককের পরিমাপ নিয়ে আর একটু আলোচনা করি।

১.৪.২ পরিমাপের পদ্ধতি

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ঠিকভাবে পরিমাপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ কিলোমিটার হাঁটতে গিয়ে যদি দেখো তোমাকে পাঁচ মাইল হাঁটতে হচ্ছে তাহলে দেড়গুণ থেকে বেশি হাঁটতে হবে। তোমার মা যদি তোমাকে পাঁচ কেজি চাল আনতে বলে আর তুমি যদি পাঁচ পাউন্ড চাল নিয়ে আস, তাহলে অর্ধেক থেকেও কম চাল আনবে! দৈনন্দিন জীবনে এরকম ভুলত্রুটি আমরা কোনোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই ভুল মারাত্মক হতে পারে। পরিমাপে ভুল করেছিল বলে ১৯৮৩ সালের ২৩শে

জুলাই এয়ার কানাডার যাত্রীবাহী একটি বোয়িং 767 বিমান মাঝপথে আবিষ্কার করল তার জ্বালানি শেষ। বিন্দুমাত্র জ্বালানি ছাড়াই দক্ষ পাইলট সেটিকে কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা রেস কোর্সে নামিয়ে আনতে পেরেছিল। আবার একই ধরনের পরিমাপের হেরফেরের কারণে নাসার (NASA) ১২৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি মহাকাশযান ১৯৯৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মঙ্গল গ্রহে বিধস্ত হয়েছিল। কাজেই পরিমাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।



১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই এয়ার কানাডার যাত্রীবাহী বোয়িং 767 বিমানের জ্বালানি হঠাৎ শেষ হয়ে যাবার পর পাইলট দক্ষ হাতে কোনো হতাহত ছাড়াই বিমানটিকে মাটিতে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন

এবারে আমরা আমাদের পরিচিত চারটি এককের বিজ্ঞানে ব্যবহারের উপযোগিতা দেখি।

দৈর্ঘ্য



দৈর্ঘ্যের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে মিটার, সংক্ষেপে m। যদিও পাশাপাশি ইঞ্চি এবং ফুটকে দৈনন্দিন জীবনে এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আমরা বিজ্ঞানের পরিমাপের জন্য এই বইয়ে মিটারকে দৈর্ঘ্যের একক হিসেবে ব্যবহার করব। তোমরা যারা একটা মিটারস্টিক হাতে নিয়েছ, তারা মিটার বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝায় সেটা অনুভব করতে পেরেছ। মোটামুটিভাবে বলা যায় একজন মানুষের পা থেকে কোমর পর্যন্ত দূরত্বটুকুই হচ্ছে এক মিটার। তবে একেবারে সঠিকভাবে এক মিটার দূরত্ব মাপার জন্য আগে একটি আদর্শ মিটারস্টিক ফ্রাগের একটি মিউজিয়ামে রাখা ছিল। এখন এক মিটার দূরত্ব মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি মজার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আলোর বেগ অনেক বেশি, এটি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অচিন্তনীয় আলোর বেগ ব্যবহার করে এক মিটার দূরত্ব বের করে ফেলেন। (তোমরা যখন একটু উপরের ক্লাসে উঠবে তখন সেটি কীভাবে করা যায় জানতে পারবে।) আলোর বেগ যেহেতু মহাবিশ্বের সব জায়গায় একই থাকে, তাই শুধু পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় নয় মহাবিশ্বের যে কোনো জায়গায় এক মিটার দূরত্ব কতটুকু সেটা অনেক সূক্ষ্মভাবে বের করে ফেলা যাবে।

তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঢাকা থেকে সিলেট কতদূর তাহলে তুমি দূরত্বটি মিটারে না দিয়ে কিলোমিটারে দেবে, এক কিলোমিটার হচ্ছে ১০০০ মিটার। ঠিক সেরকম যদি তোমাকে তোমার নখের দৈর্ঘ্য কত জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি সেই দৈর্ঘ্যটি মিটারে না বলে মিলিমিটারে বলবে, মিলিমিটার হচ্ছে এক মিটারের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। মিলিমিটারের পাশাপাশি সেন্টিমিটারও ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। এক সেন্টিমিটার হচ্ছে এক মিটারের ১০০ ভাগের ১ ভাগ কিংবা ১০ মিলিমিটার। মিলিমিটারের চাইতেও ছোট দৈর্ঘ্যের জিনিস সাধারণত আমাদের খালি চোখে মাপজোখ করতে হয় না।

কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তোমাকে যদি কোনো একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য বলতে হয় তাহলে তোমাকে বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করতে হবে দূরত্বটি মিটারে বলবে নাকি কিলোমিটারে বলবে কিংবা সেন্টিমিটারে বলবে নাকি মিলিমিটারে বলবে। সত্যি কথা বলতে কি তোমরা যখন মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ে পড়বে তখন দেখবে আমাদের এর বাইরেও কাজের সুবিধার জন্য অন্য একটা একক ব্যবহার করতে হচ্ছে!

ভর



ভরের একক হচ্ছে কিলোগ্রাম বা সংক্ষেপে কেজি (kg)। এক সময় ‘আসল’ এক কেজি একটা ভর ফ্রাগের একটি মিউজিয়ামে রাখা হতো। ২০১৯ সালের মে মাস থেকে ‘আদর্শ’ বা ‘আসল’ এককের জন্য কোনো মিউজিয়ামে রক্ষা করা ভরের উপর নির্ভর করতে হয় না। বিজ্ঞানের কিছু ধ্রুব থেকে সেগুলো বের করে ফেলা যায়।

সম্ভবত আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি বার কেজি

ব্যবহার করি। যেহেতু আমরা আজকাল পানি কিংবা সফট ড্রিঙ্কের বোতলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই বলতে পারি এক লিটারের বোতল বোঝাই পানি কিংবা সফট ড্রিঙ্কের ভর হচ্ছে এক কেজি। কিংবা সাধারণ গ্লাসের চার গ্লাস পানির ভর হচ্ছে এক কেজি।

তোমাদের কারো কারো মনে হয়ত খটকা লাগছে যে আমরা ওজন মাপার জন্য কেজি ব্যবহার করি, আমাদের ওজন ৩০ কেজি বলতে আমরা খুবই অভ্যস্ত, তাহলে প্রচলিত ওজন শব্দটা ব্যবহার না করে বার বার ভর কথাটা কেন ব্যবহার করছি?

তার কারণটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ভাষায় ভর আর ওজনের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য। ভরের একক হচ্ছে কেজি। ওজনের অন্য একটি একক, তোমরা উপরের ক্লাসে সেগুলো জানবে। কাজেই বিজ্ঞানের ভাষায় তোমার ওজন ৩০ কেজি কথাটি ভুল, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না! এক ভর অন্য ভরকে আকর্ষণ করে; পৃথিবীর ভর যেহেতু অনেক বেশি তাই তার আকর্ষণটাও বেশি, এই আকর্ষণটাই আসলে ওজন। চাঁদের ভর যেহেতু পৃথিবীর ভর থেকে কম তাই তুমি যদি চাঁদে যাও তাহলে দেখবে সেখানে তোমার উপর চাঁদের আকর্ষণও কম। অর্থাৎ তোমার মনে হবে তোমার ওজনও কম, এক লাফে তুমি অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে। কাজেই পৃথিবী এবং চাঁদ দুই জায়গাতেই তোমার ভর ৩০ কেজি হলেও পৃথিবী এবং চাঁদে তোমার ওজন ভিন্ন!

দৈর্ঘ্যের বেলায় দেখেছি মিটারের পাশাপাশি ইঞ্চি এবং ফুটও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভরের জন্যও কেজির পাশাপাশি পাউন্ড ব্যবহার হতো তবে আজকাল সেটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহৃত হয়। দৈর্ঘ্যের বেলাতে আমরা কম কিংবা বেশি দূরত্ব বোঝানোর জন্য সেন্টিমিটার বা কিলোমিটার ব্যবহার করেছি, ভরের বেলাতেও তাই। কম ভরের বেলায় আমরা গ্রাম (g) ব্যবহার করি যেটা কিলোগ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। তার চাইতেও কম ভর মাপার জন্য আমরা মিলিগ্রাম (mg) ব্যবহার করি যেটা গ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। তোমরা ওষুধের ট্যাবলেটে দেখবে সেখানকার সক্রিয় উপাদানটির পরিমাণ সবসময় mg-এ দেওয়া থাকে।

সময়



যতগুলো রাশি আছে তার মধ্যে সময় রাশিটি নিশ্চয়ই আমাদের পরিচিত রাশি। এর মূল এককটি নিয়ে পৃথিবীতে কোনো বিভাজন নেই। সবাই সেকেন্ডকে (s) সময়ের একক হিসেবে মেনে নিয়েছে। খাঁটি বিজ্ঞানের বেলায় এক সেকেন্ড ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরমাণুর নির্দিষ্ট সংখ্যক কম্পনের সময়কে ধরে নিলেও আমরা মুখে ‘এক হাজার এক’ কথাটি উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে এক সেকেন্ড হিসেবে অনুভব করতে পারি। দৈর্ঘ্য এবং ভরের বেলায় কিলোমিটার এবং কিলোগ্রাম থাকলেও সময়ের বেলায় কিলোসেকেন্ড নেই! তোমরা সবাই জানো ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট এবং ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা ধরে নেওয়া হয়। তবে কিলোসেকেন্ড না থাকলেও মিলিসেকেন্ড আছে। সেটি হচ্ছে ১ সেকেন্ডের ১০০০ ভাগের এক ভাগ, তবে এই সময়টি

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করার জন্য বেশ ছোট।

আমাদের চারপাশে ১ সেকেন্ডের কাছাকাছি অনেক উদাহরণ আছে। আমাদের হৃৎস্পন্দন সেকেন্ডে ১ বার করে হয়, কারো একটু বেশি, কারো একটু কম। আমরা চোখের পাতা ফেলি প্রতি দুই সেকেন্ডে একবার, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। নিশ্বাস নেই প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একবার, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম!

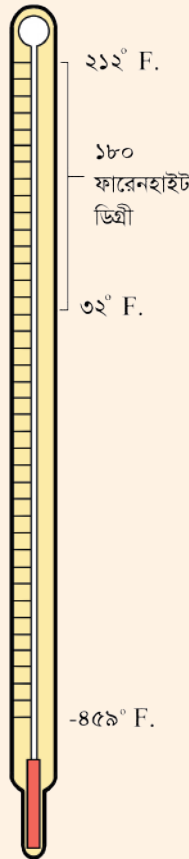
তাপমাত্রা



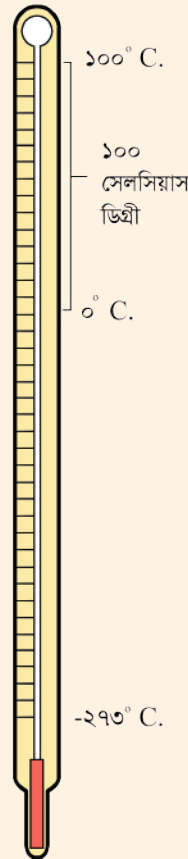
আমরা সবাই কখনো না কখনো বলেছি ‘গরম লাগছে’ কিংবা ‘ঠান্ডা লাগছে’। আমরা এটাও জানি চা গরম এবং আইসক্রিম ঠান্ডা; গরম এবং ঠান্ডা কথাটি দিয়ে আমরা আসলে বোঝাই ‘তাপমাত্রা’ নামক রাশিটি তুলনামূলকভাবে বেশি বা কম। কাজেই আমরা আসলে তাপমাত্রাটি আমাদের শারীরিক অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি, অবশ্যই যদি সেটা

আমাদের সহ্য ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

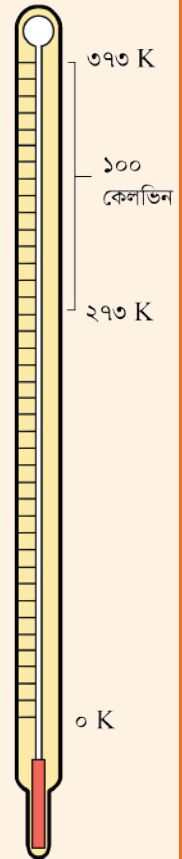
তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কেলভিন (K), যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কখনো ব্যবহার করি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাপমাত্রার জন্য যে এককটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে সেলসিয়াস (°C)। এই এককে পানি জমে বরফ হওয়ার তাপমাত্রা ধরা হয়েছে 0°C এবং পানি ফুটে বাষ্প হওয়ার তাপমাত্রা ধরা হয়েছে 100°C। তবে মজার বিষয় হচ্ছে কেলভিন এককের বেলাতেও পানি বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা



ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা



সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা



কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা

এবং বরফের তাপমাত্রার পার্থক্য 100K ।

অর্থাৎ কোনো কিছুর তাপমাত্রা 10°C বেড়ে গিয়েছে বলা যে কথা 10K বেড়ে গিয়েছে বলা একই কথা। স্বাভাবিকভাবেই তুমি তাহলে প্রশ্ন করতে পার এই দুটি এককের মধ্যে পার্থক্য কী?

পার্থক্য হচ্ছে 273.15° !

অর্থাৎ সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রার সাথে 273.15 যোগ করলে কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেলভিন স্কেলে বরফের তাপমাত্রা হচ্ছে $0 + 273.15 = 273.15\text{ K}$ এবং পানি বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা হচ্ছে $100 + 273.15 = 373.15\text{ K}$ ।

স্বাভাবিকভাবেই তুমি তাহলে প্রশ্ন করবে সেলসিয়াসের এত সহজ সরল স্কেলের সাথে এই বিচিত্র একটি সংখ্যা যোগ দিয়ে কেলভিন স্কেল তৈরি করার কারণ কী?

কারণটি কিন্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। তুমি যে কোনো কিছুর তাপমাত্রা যত ইচ্ছা বাড়াতে পারবে, তার কোনো সীমা নেই! কিন্তু তাপমাত্রা যত ইচ্ছা কমাতে পারবে না। তাপমাত্রার একটা সর্বনিম্ন মান আছে। সত্যি কথা বলতে কী তুমি এই তাপমাত্রার কাছাকাছি যেতে পারবে কিন্তু কখনই সেই তাপমাত্রায় পৌঁছাতে পারবে না। এটাকে বলে পরম শূন্য তাপমাত্রা। কেলভিন স্কেলটি তৈরি করা হয়েছে এই তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রা হচ্ছে -273.15° তাই সেলসিয়াস স্কেলের সাথে 273.15 যোগ দিলে কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়।

যাই হোক, সেলসিয়াস স্কেলের পাশাপাশি ফারেনহাইট নামে আরও একটি তাপমাত্রা স্কেল কোনো কোনো দেশে এবং জ্বর মাপার থার্মোমিটারে ব্যবহার করা হয়। সেই স্কেলে বরফের তাপমাত্রা 32°F এবং ফুটন্ত পানির তাপমাত্রা 212°F । ফারেনহাইট স্কেলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.6°F সেলসিয়াসে যেটা 37°C ।

১.৪.৩ মৌলিক একক এবং যৌগিক একক

আমরা দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এবং তাপমাত্রা এই চারটি রাশি পরিমাপ করার জন্য এককের কথা বলেছি। সেগুলো হচ্ছে মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড এবং কেলভিন। এগুলো হচ্ছে মৌলিক একক। কাজেই আমরা যদি কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে শুধু মৌলিক একক মিটার দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি একটা ঘরের ক্ষেত্রফল মাপতে চাই তাহলে সেটা মৌলিক একক মিটার দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। ঘরটির দৈর্ঘ্য যদি ৫ মিটার এবং প্রস্থ ২ মিটার হয় তাহলে ঘরটির ক্ষেত্রফল,

ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য \times প্রস্থ = ৫ মিটার \times ২ মিটার = ১০ বর্গমিটার

যেহেতু এককটি 'বর্গমিটার' তাই সেটাকে আমরা বলব যৌগিক একক। ঠিক একটা গাড়ি যদি ৩

সেকেন্ডে ১৫ মিটার যায় তাহলে তার বেগ হচ্ছে,

$$\text{বেগ} = 15 \text{ m} / 3 \text{ s}$$

$$= 5 \text{ m/s}$$

প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার বা ৫ m/s।

এবারের এককটি হচ্ছে মিটার/সেকেন্ড, এটিও দুটি ভিন্ন একক দিয়ে তৈরি হয়েছে। কাজেই এটা হচ্ছে যৌগিক একক।

সম্ভাবনা

?

- ১। তোমরা নিশ্চয়ই পিঁপড়াকে সারি বেঁধে যেতে দেখেছ। সারিটি ভেঙে দিলেও কিছুক্ষণের ভেতর পিঁপড়ারা আবার তাদের সারিটি তৈরি করে ফেলে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি ব্যবহার করে তোমরা কি বের করতে পারবে পিঁপড়া কীভাবে এটি করে?
- ২। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ছয়টি ধাপের মাঝে কোনটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? কেন?
- ৩। বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানমনস্ক এই দুইটির মাঝে পার্থক্য কী?
- ৪। ধরা যাক চাঁদে তুমি একটা মুদির দোকান দেবে। সেই দোকানে বেচা-কেনা করার জন্য তুমি কি দাড়িপাল্লা ব্যবহার করবে নাকি স্প্রিং ব্যালেন্স ব্যবহার করবে? কেন?
- ৫। লম্বা সুতা দিয়ে ছোট একটা পাথর ঝুলিয়ে সেটা দুলাতে কত সময় নেয় বের করো। এখন সুতার দৈর্ঘ্য এবং পাথরের ভর বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দোলনের সময় বের করে দেখ সেটার কি কোনো পরিবর্তন হয়?
- ৬। $T_F = (T_C \times 9) / 5 + 32$ তুমি এই সূত্র ব্যবহার করে সেলসিয়াসে তাপমাত্রা (T_C) দেওয়া থাকলে সেটি ফারেনহাইটে (T_F) কত হবে বের করতে পারবে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট দুই স্কেলেই তার মান সমান, সেটি কত বের করতে পারবে?



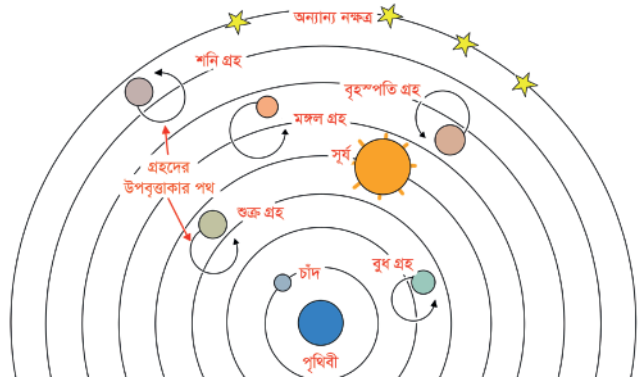
ଅଧ୍ୟାୟ ୧
ପୃଥିବୀ ଓ ମହାବିଶ୍ଵ

যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করা মানুষেরা আকাশের চন্দ্র, সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখেছেন তারা স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা করে নিয়েছেন যে নিশ্চয়ই চন্দ্র-সূর্য এমনকি নক্ষত্রগুলোও পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরে। এরিস্টটল সেই যুগের অনেক জ্ঞানী একজন মানুষ ছিলেন, তিনিও এই মতবাদ দিয়েছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ টলেমি এরিস্টটলের ধারণাটির পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন যে পৃথিবী হচ্ছে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু এবং সকল গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এই পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরে। প্রায় দুই হাজার বছর পৃথিবীর মানুষ এটা বিশ্বাস করেছিল কারণ সবার কাছে সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল, শুধু তাই নয় তাদের ধর্মগ্রন্থও সেটি সমর্থন করেছে।



ছবি: টলেমি

কিন্তু যেসব বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ আকাশের গ্রহ নক্ষত্র নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন তারা কিছু কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারতেন না—যেমন মাঝে মাঝে তারা একটি গ্রহকে আকাশে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে থেমে যেতে দেখতেন; শুধু তাই নয় তারপর গ্রহটি উল্টোদিকে যেতে শুরু করে মাঝপথে থেমে গিয়ে আবার সঠিক দিয়ে প্রদক্ষিণ শুরু করত। একটি গ্রহ যদি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তাহলে সেটা কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কিন্তু পৃথিবী এবং অন্য গ্রহগুলো যদি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহলে খুব সহজেই এই বিচিত্র গতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব।



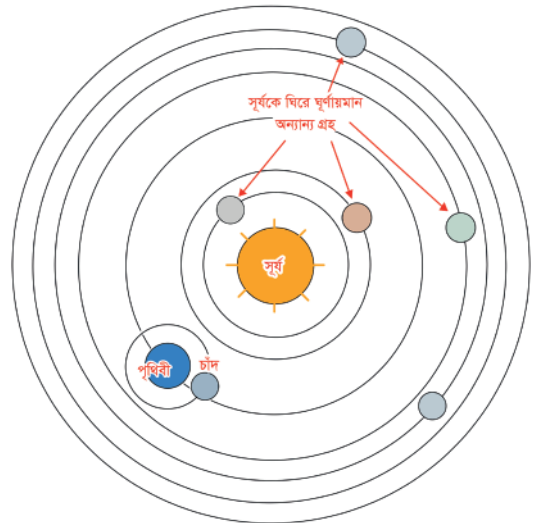
ছবি: টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেল



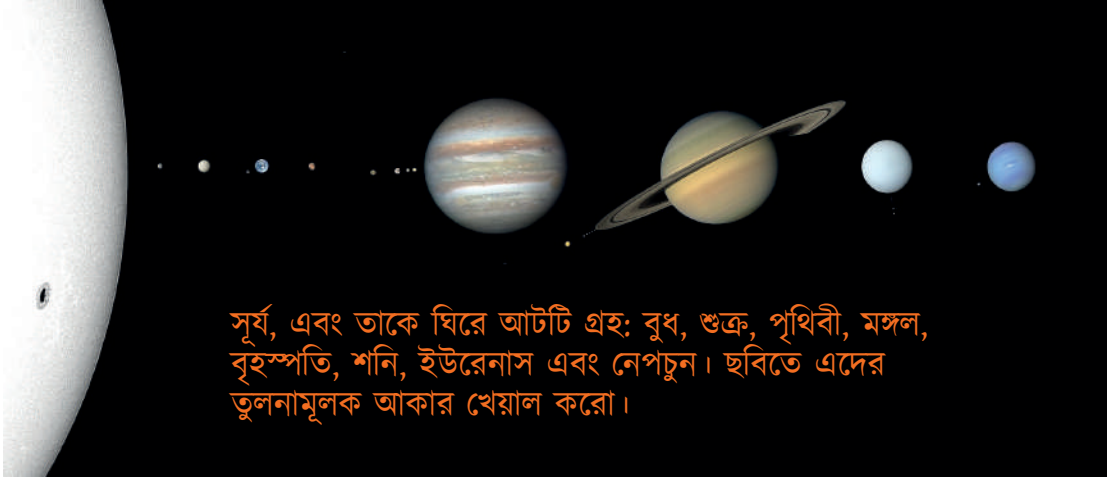
ছবি: কোপার্নিকাস

এই ধরনের বেশ কিছু বিষয় দেখে কোপার্নিকাস ১৪৮৪ সালে প্রথমে তাঁর বইয়ে লিখলেন পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র নয়, পৃথিবীসহ অন্য সব গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। বইটির প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই

কোপার্নিকাসের মৃত্যু হয় বলে সেটি বিজ্ঞানীদের মহলে বেশি প্রচার লাভ করেনি। তবে কোপার্নিকাসের মৃত্যুর প্রায় ১০০ বছর পর তাঁর বইগুলো আবার প্রকাশিত হয় এবং হঠাৎ করে সেটি বিজ্ঞানীদের মহলে বিশাল



ছবি: সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেল



সূর্য, এবং তাকে ঘিরে আটটি গ্রহ: বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন। ছবিতে এদের তুলনামূলক আকার খেয়াল করো।

আলোড়নের সৃষ্টি করে। গ্যালিলিও তখন টেলিস্কোপ ব্যবহার করে নিয়মিত মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলেন কোপার্নিকাসের মতবাদটি সঠিক, সকল গ্রহ আসলে সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে।

যখন গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের মতবাদকে সমর্থন করে তা প্রচার করতে শুরু করলেন, তখন ক্যাথলিক চার্চ গ্যালিলিওর উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কারণ এই মতবাদ তাদের ঐশ্বরিক বিশ্বাসের বিরোধী। তারা গ্যালিলিওকে বিচার করে বাকি জীবন তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে। তোমরা জেনে অবাক হয়ে যাবে যে ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিওকে ক্যাথলিক চার্চ ক্ষমা করেছিল।

১৬৬৪ সালে নিউটন তাঁর বিখ্যাত মহাকর্ষ বলের সূত্র প্রকাশ করেন এবং সেটি ব্যবহার করে সূর্যকে ঘিরে বিভিন্ন গ্রহের প্রদক্ষিণ নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক মহল তখন সন্দেহাতীতভাবে সূর্যকে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল হিসেবে মেনে নিল।

২.২ সৌরজগৎ

আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য, এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে আটটি গ্রহ। গ্রহগুলো হচ্ছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন। এর মাঝে বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে এবং নেপচুন সবচেয়ে দূরের গ্রহ। কিছুদিন আগেও প্লুটোকে নবম গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, কিন্তু গ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটিকে তার কক্ষপথের সকল জঞ্জল নিজের আকর্ষণে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। প্লুটো আকারে সবচেয়ে ছোট হওয়ায় সেটি করতে পারত না, সেজন্য এটিকে ২০০৬ সাল থেকে আর গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

নেপচুন
(Neptune)

ইউরেনাস
(Uranus)

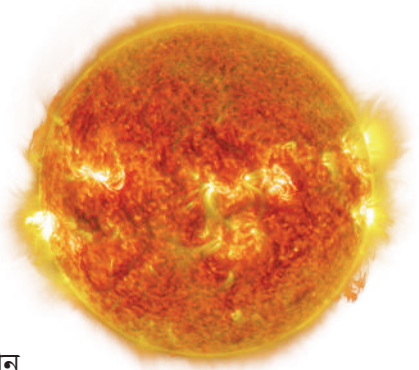
সূর্য, এবং তাকে ঘিরে আটটি গ্রহ। ছবিতে সূর্য থেকে গ্রহদের তুলনামূলক দূরত্ব খেয়াল করো।

২.২.১ সৌরজগতের সৃষ্টি

অনুমান করা হয় আমাদের সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন বা সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে। শুরুতে এটি ছিল কিছু গ্যাস এবং ধূলিকণার মিশ্রণ। কাছাকাছি কোনো একটি সুপারনোভা নক্ষত্রের বিস্ফোরণের কারণে তার প্রবল ঝাপটায় এই গ্যাস এবং ধূলিকণার মিশ্রণ সংকুচিত হয়ে একটি গ্যাসপিণ্ডে পরিণত হয়ে ঘুরতে শুরু করে। ধীরে ধীরে পুরো গ্যাসপিণ্ডের নিরানব্বই শতাংশ থেকে বেশি পদার্থ কেন্দ্রে জমা হয়, যেটি পরবর্তীকালে নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়ে আলো এবং তাপ দিতে শুরু করে এবং বাকি প্রায় এক শতাংশ পদার্থ এই নক্ষত্রকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে নিজেরা ছোটবড় নানা পিণ্ডে পরিণত হতে থাকে। কেন্দ্রের নক্ষত্রটি হচ্ছে সূর্য এবং তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকা ছোটবড় নানা পিণ্ডগুলো হচ্ছে সৌরজগতের গ্রহ।

সূর্য (Sun):

সৌরজগতের কেন্দ্রের সূর্য আমাদের নিজেদের নক্ষত্র। এটি আমাদের সৌরজগতে সবচেয়ে বড়, পুরো সৌরজগতের ভরের ৯৯.৮৬ শতাংশ ভর হচ্ছে সূর্যের। আকারে এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১০০ গুণ চওড়া, এবং এটি পৃথিবী থেকে ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে। এটি আসলে একটি উত্তপ্ত গ্যাসের পিণ্ড, যেখান থেকে আলো এবং তাপ বের হয়। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৫৫০০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাঝে মাঝে সূর্যের পৃষ্ঠে বিস্ফোরণ ঘটে তখন সেখান থেকে আয়নিত কণা বের হয়ে আসে এগুলোকে বলে সৌর ঝড় (Solar wind)। সূর্য থেকে সৌর ঝড় পৃথিবীতে আসতে ১ থেকে ৫ দিন সময় নেয়।



বুধ (Mercury):



সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ, পাথুরে এবং উত্তপ্ত। সূর্যের খুব কাছাকাছি থাকায় পৃথিবী থেকে খুব সহজে এটাকে দেখা যায় না। এটা সবচেয়ে ছোট গ্রহ, আমাদের চাঁদ থেকে একটুখানি বড়। পৃথিবীর মত বুধ গ্রহেরও দিন-রাত হয় তবে বুধের একদিন পৃথিবীর ৬ মাসের সমান। বুধ গ্রহ পৃথিবীর হিসাবে ৮৮ দিনে সূর্যকে একবার ঘুরে আসে, অর্থাৎ এর বছর হয় মাত্র তিন মাসে।

শনি
(Saturn)

বৃহস্পতি
(Jupiter)

মঙ্গল (Mars)
পৃথিবী (Earth)
শুক্র (Venus)
বুধ (Mercury)
এবং সবার ডানে সূর্য (Sun)

শুক্র (Venus):

শুক্র দ্বিতীয় গ্রহ, এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল আছে। আকার পৃথিবী থেকে একটু ছোট তবে কাছাকাছি। এটি মেঘে ঢাকা থাকে এবং এজন্য তাপ আটকে থাকে বলে শুক্র গ্রহ সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ। এর গড় তাপমাত্রা ৪৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সীসার গলনাঙ্ক থেকেও প্রায় ১০০ ডিগ্রি বেশি! অন্য সব গ্রহ তার অক্ষের উপর যদিকে ঘুরে শুক্র গ্রহ তার বিপরীত দিকে ঘুরে। অর্থাৎ শুক্র গ্রহে সূর্য ওঠে পশ্চিমদিকে এবং দুই মাস পরে পূর্ব দিকে অস্ত যায়। শুক্রের একদিন পৃথিবীর প্রায় চার মাসের সমান। বুধ এবং শুক্রের দিন পৃথিবীর দিনের তুলনায় অনেক বড় হলেও পরবর্তী সব গ্রহের দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় কাছাকাছি।



পৃথিবী (Earth):

পৃথিবী সূর্য থেকে তৃতীয় গ্রহ, এটি একমাত্র গ্রহ যেখানে পৃষ্ঠদেশে পানি রয়েছে, বায়ুমণ্ডল আছে, গড় তাপমাত্রা আরামদায়ক ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পৃথিবী হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের উন্মেষ হয়েছে। এর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬০০০ কিমি। পৃথিবী থেকে শুরু করে পরবর্তী অন্য সব গ্রহের এক দিন মোটামুটি কাছাকাছি। তবে সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব যত বাড়তে থাকে, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় তত বাড়তে থাকে।



মঙ্গল (Mars):

মঙ্গল সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ। অন্য যে কোনো গ্রহের তুলনায় পৃথিবীর সাথে মঙ্গল গ্রহের মিল সবচেয়ে বেশি। এটি ধূলাময়, লালচে এবং মরুভূমির মতো, এর আকার পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। এখানে খুব হালকা এক ধরনের বায়ুমণ্ডল আছে। মঙ্গল গ্রহের একদিন পৃথিবীর একদিনের খুব কাছাকাছি। সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে মঙ্গল গ্রহের প্রায় দুই বছর সময় নেয়। সূর্য থেকে দূরত্বের কারণে মঙ্গল থেকে শুরু করে পরবর্তী অন্য সব গ্রহের তাপমাত্রা শূন্য থেকে অনেক নিচে।



বৃহস্পতি (Jupiter):

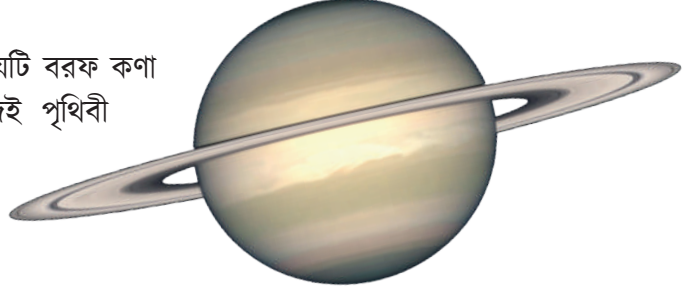
বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ, অন্য সবগুলো গ্রহ মিলিয়ে যত ভর হয়, বৃহস্পতির ভর তার থেকে আড়াই গুণ বেশি! বৃহস্পতিকে পৃথিবী থেকে উজ্জ্বল গ্রহ



হিসেবে দেখা যায়। টেলিস্কোপে বৃহস্পতি গ্রহে একটি বিশাল চোখের মত লাল ক্ষেত্র দেখা যায় যেটি শত শত বছর থেকে চলমান একটি বিশাল ঘূর্ণিঝড়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল এই চারটি গ্রহ আকারে ছোট এবং শক্ত পাথুরে, কিন্তু বৃহস্পতি থেকে শুরু করে এরপরের সবগুলো গ্রহ দানবাকৃতির এবং গ্যাসের তৈরি।

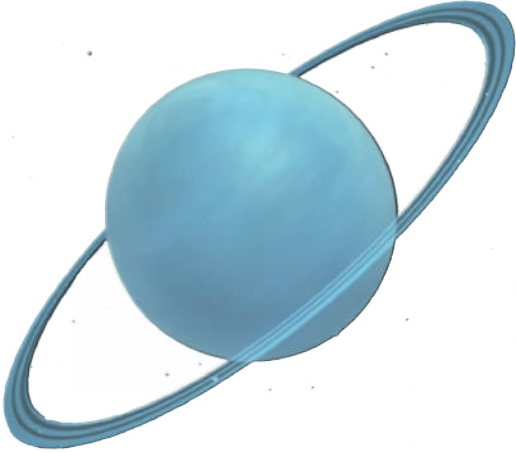
শনি (Saturn):

শনি গ্রহে একটি চমকপ্রদ বলয় রয়েছে যেটি বরফ কণা দিয়ে তৈরি এবং টেলিস্কোপে খুব সহজেই পৃথিবী থেকে এই বলয়টি দেখা যায়। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর ২৯ বছর লেগে যায়, কিন্তু পৃথিবীর একদিনে শনি গ্রহের প্রায় দুদিন পার হয়ে যায়।



ইউরেনাস (Uranus):

সৌরজগতের গ্রহগুলো তাদের কক্ষপথের সাথে প্রায় লম্বভাবে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু ইউরেনাস তার ব্যতিক্রম, এই গ্রহটি তার কক্ষপথে প্রায় শুয়ে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অনুমান করা হয় কোনো এক সময়ে একটি বিশাল গ্রহ অথবা গ্রহাণুর সাথে সংঘর্ষের কারণে এর অক্ষটি এভাবে বাঁকা হয়ে গেছে। শনি গ্রহের মত ইউরেনাসেরও একটি সূক্ষ্ম বলয় রয়েছে।



নেপচুন (Neptune):

সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের গ্রহ হচ্ছে নেপচুন। এটি এত দূরে যে সূর্যকে ঘিরে ঘুরে আসতে পৃথিবীর যেখানে মাত্র এক বছর লাগে সেখানে

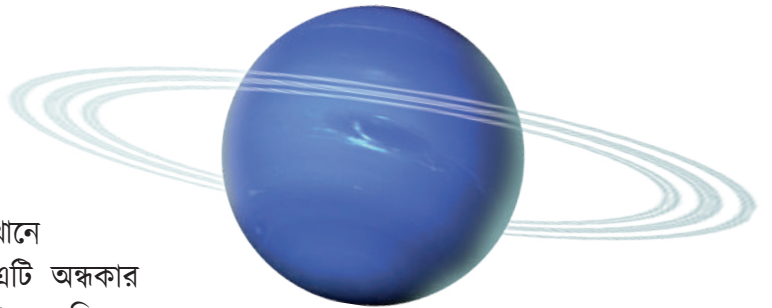
নেপচুনের ১৬৫ বছর কেটে যায়। এটি অন্ধকার

এবং হিমশীতল, এর গড় তাপমাত্রা শূন্যের নিচে ২০০

ডিগ্রি। এই বিচিত্র গ্রহে শব্দ থেকেও দ্রুত বেগে ঝড় বইতে

থাকে। নেপচুন হচ্ছে এমন একটি গ্রহ যেটি জ্যোতির্বিদরা টেলিস্কোপে

দেখার আগেই অন্য গ্রহের গতিবিধির উপর এর প্রভাব দেখে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন।





শিল্পীর চোখে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রহাণু

গ্রহাণু বলয় (Asteroid belt):

মঙ্গল গ্রহ এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝামাঝি রয়েছে গ্রহাণু বলয়। এখানে ছোট ছোট লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে। অনুমান করা হয় অতিকায় দানবাকৃতির বৃহস্পতি গ্রহের প্রবল আকর্ষণের কারণে এই গ্রহাণুগুলো একত্র হয়ে একটি গ্রহ হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝেই কোনো একটি গ্রহাণু বৃহস্পতি কিংবা মঙ্গল গ্রহের আকর্ষণে কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। অনুমান করা হয় ৬৫০ লক্ষ বছর আগে এরকম একটি গ্রহাণুর আঘাতে পৃথিবীতে যে প্রলয় কাণ্ড ঘটেছিল তার কারণে পৃথিবী থেকে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

চাঁদ (Moon):

আমরা সবাই আমাদের পৃথিবীর চাঁদকে দেখেছি। পৃথিবীকে ঘুরে আসতে চাঁদ ২৯.৫ দিন সময় নেয়। ৩০টি পৃথিবী পাশাপাশি রাখলে যে দূরত্ব হবে চাঁদ পৃথিবী থেকে ততটুকু দূরে। পৃথিবীর বাইরে শুধু চাঁদে মানুষ পা ফেলেছে। চাঁদের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের আনুমানিক চার ভাগের একভাগ। চাঁদ থাকার কারণে পৃথিবী অনেক স্থিতিশীল এবং এখানে আমাদের জীবন যথেষ্ট সহজ হয়েছে।



সম্পূর্ণনী ?

১. শুক্র গ্রহের অন্য নাম কী? এটি শুধু ভোরে কিংবা সন্ধ্যায় কেন দেখা যায়?
২. পৃথিবীর বাইরে আর কোন গ্রহে মানুষ বসতি স্থাপন করতে পারে? কেন?
৩. প্রত্যেকটি গ্রহের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলো যেটি অন্য গ্রহগুলোতে নেই?

DRACO

M82

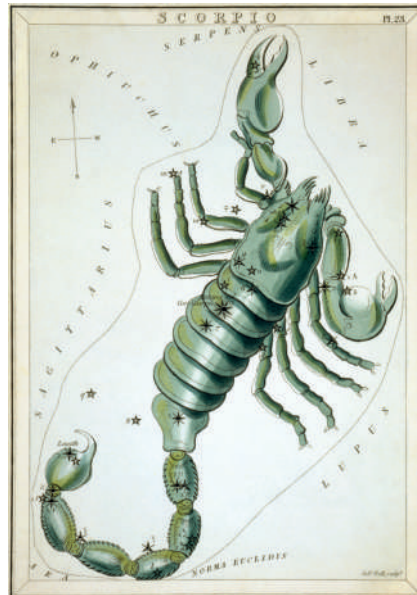
M81

 σ^2 ρ π_1 π_2

+50°

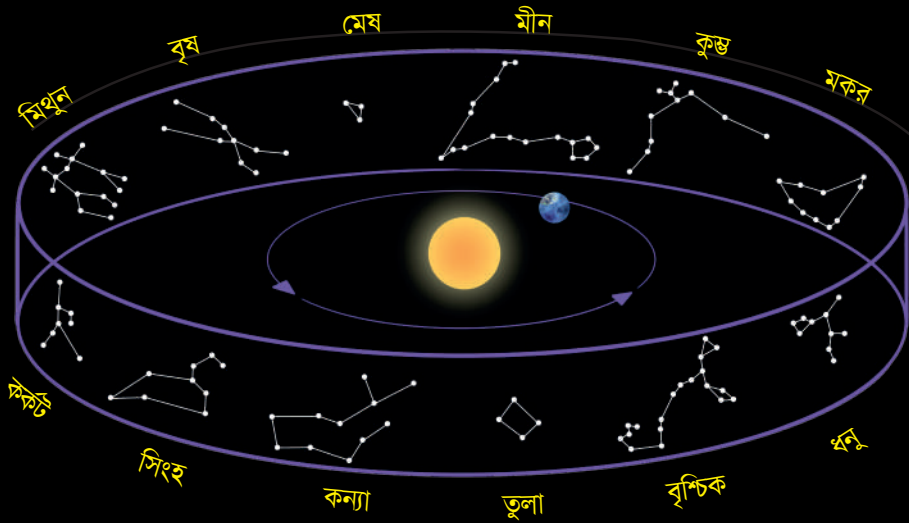
২.৩ নক্ষত্রমণ্ডলী

তোমরা যদি রাতের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাও তাহলে সেখানে অসংখ্য নক্ষত্র দেখবে, কোনো কোনোটা জ্বলজ্বল করছে, আবার কোনো কোনোটা মিটমিট করছে। শুধু তাই নয়, তুমি সেগুলোর মাঝে রঙের বৈচিত্র্যও দেখতে পাবে। তোমার যদি কল্পনাশক্তি থাকে, নিশ্চিতভাবেই তুমি সেই নক্ষত্রগুলো দিয়ে কোনো একটা ছবি কল্পনা করে নিতে পারবে! সেই প্রাচীনকাল থেকেই অনেক ধরনের কল্পনা করে অনেক ধরনের পৌরাণিক কাহিনীর ছবি কল্পনা করা হয়েছে, তোমাদের সেরকম কয়েকটি ছবি দেখানো হলো।



নক্ষত্রের বিন্যাস দেখে প্রাচীন মানুষের কল্পনার ছবি:

- উপরে বামে 'অরায়ন' বা 'কালপুরুষ'
- উপরে ডানে 'উরসা মেজর' বা 'বড় ভালুক'
- নিচের ছবিতে 'স্করপিও' বা 'বৃশ্চিক'



নক্ষত্রমণ্ডলী যেহেতু আমাদের সৌরজগৎ থেকে অনেক দূরে তাই আকাশের কোথায় কখন দেখা যাবে তার পরিবর্তন হলেও তাদের আকারের পরিবর্তন হয় না। একটি নক্ষত্রকে আকাশে খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও কয়েকটি নক্ষত্র মিলে যখন একটি বিশেষ আকার তৈরি করে তখন সেটি বেশ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। কাজেই আকাশে নক্ষত্রের একটা ম্যাপ তৈরি করার জন্য নক্ষত্রমণ্ডলীকে ব্যবহার করে আকাশকে বারো ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নক্ষত্রমণ্ডলীর সাথে একটা করে ছবি কল্পনা করে তাদেরকে সেরকম নামও দেওয়া হয়েছে। (ছবিতে তোমাদের সেরকম উদাহরণ দেখানো হলো) জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের এই বিভাজনকে ব্যবহার করেন।

তোমরা জেনে নিশ্চয়ই অবাক হবে আমাদের বাংলা মাসগুলো এই নক্ষত্রমণ্ডলীর উদয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর খুব বেশি জাতির নিজস্ব ক্যালেন্ডার নেই, আমাদের আছে। শুধু তাই নয়, সেটি আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর সাথে মিলিয়ে করেছেন, সেটি নিয়ে তোমরা গর্ব করতে পারো!

জ্যোতিষবিদ্যা

এবারে তোমরা জানবে, কীভাবে বিজ্ঞানের একটা বিষয়কে কুসংস্কারের জন্য ব্যবহার করা হয়। তোমাদের যে কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই কখনো না কখনো সেগুলোর নাম শুনেছ, কারণ ভাগ্য গণনার জন্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীকে ব্যবহার করা হয়। শুভ সময় এবং অশুভ সময় নির্ণয় করার জন্যও এগুলো ব্যবহার করা হয়।

জ্যোতিষচর্চার জন্য জন্মক্ষণে কোন নক্ষত্রমণ্ডলীর উদিত হচ্ছিল—সেটি দিয়ে একজনের রাশি নির্ণয় করা হয়। তারপর এগুলোর অবস্থান ব্যবহার করে বিভিন্ন মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর ৮ বিলিয়ন (আটশত কোটি) মানুষের ভাগ্য মাত্র বারোটি ভাগে ভাগ করা যায়—এটি কী বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? দুঃখের কথা হচ্ছে, দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকা এই রাশিচক্র দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় বর্ণনা করে থাকে। তাদের সবার উচিত শুরুতে ঘোষণা দেওয়া যে, এই পদ্ধতিতে ভাগ্য নির্ণয়ের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

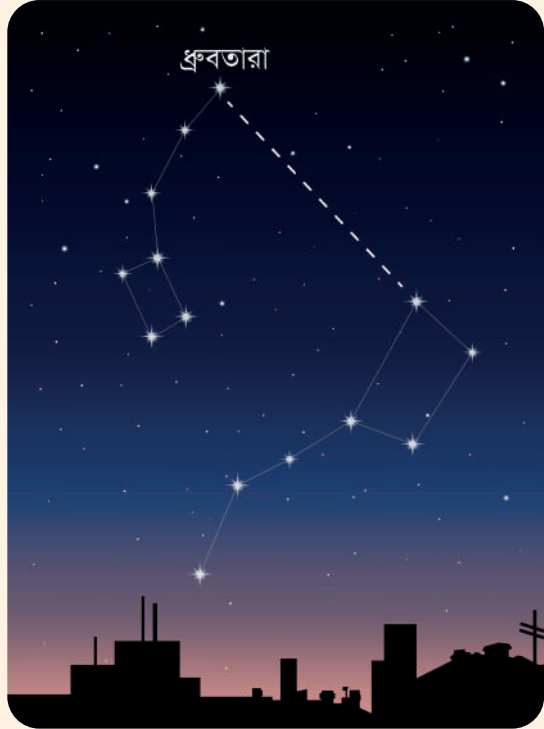
নক্ষত্রমণ্ডলী পর্যবেক্ষণ



আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর সাথে পরিচিত হওয়া একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। কেউ যখন নিজ দেশ ছেড়ে বিদেশে যায়, তখন সবকিছু অপরিচিত থাকলেও আকাশের দিকে তাকালে তার পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডলী দেখে এক ধরনের আনন্দ পেতে পারে। এখানে তোমার জন্য দুটি নক্ষত্রমণ্ডলীর কথা বলা হলো, তোমরা ইচ্ছা করলে আরও নক্ষত্রমণ্ডলী খুঁজে বের করতে পারবে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল

পৃথিবী যেহেতু তার অক্ষের উপর ঘুরছে তাই আমাদের সকল গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে পৃথিবীকে ঘিরে বিপরীত দিকে ঘুরছে দেখতে পাই। শুধু একটা নক্ষত্র পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির থাকে, কখনো ঘুরে না—সেটি হচ্ছে ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির কারণ পৃথিবীর অক্ষ উত্তর দক্ষিণ বরাবর এবং ধ্রুবতারা পৃথিবীর ঠিক উত্তর দিকে! সেটি খুঁজে পাওয়া সহজ। তোমরা যদি রাতের আকাশের উত্তর দিকে তাকাও তাহলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো সাজানো সাতটি তারা দেখবে (ইংরেজিতে তাকে Big Dipper বলে) এর উপরের দুটি তারা দিয়ে একটা সরলরেখা কল্পনা করে খানিকদূর এগিয়ে গেলে সেটি ধ্রুবতারাকে স্পর্শ করবে। সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবতারাকে ঘিরে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরছে, তাই বছরের কোন সময় এবং রাতের কোনক্ষণে সেটি দেখছ তার উপর নির্ভর করবে সেটি কোথায়, সেটি সোজা না উল্টা!



কালপুরুষ

কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী শীতের সময় সন্ধ্যাবেলা পূর্ব আকাশে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। এর গঠন এত চমকপ্রদ এটি চিনতে কোনো ভুল হয় না। তোমাদেরকে আগেই দেখানো হয়েছে যে, এটাকে তরবারি হাতে একজন যোদ্ধা কল্পনা করা হয়। যোদ্ধার বেলেটর নিচে যে তরবারি ঝুলছে তার মাঝামাঝি নক্ষত্রটি একটি নেবুলা, এবং তার কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য থেকে ২০০ গুণ ভারি একটি ব্ল্যাকহোল।

তুমি এই নক্ষত্রটি একবার নিজের চোখে দেখে নিলে সবার কাছে গর্ব করে বলতে পারবে “আমি নিজের চোখে একটি ব্ল্যাকহোল দেখেছি।”





ଅଧ୍ୟାୟ ୭
ଗତି

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ বিভিন্ন ধরনের গতি
- ☑ বেগের পরিমাপ
- ☑ ত্বরণ

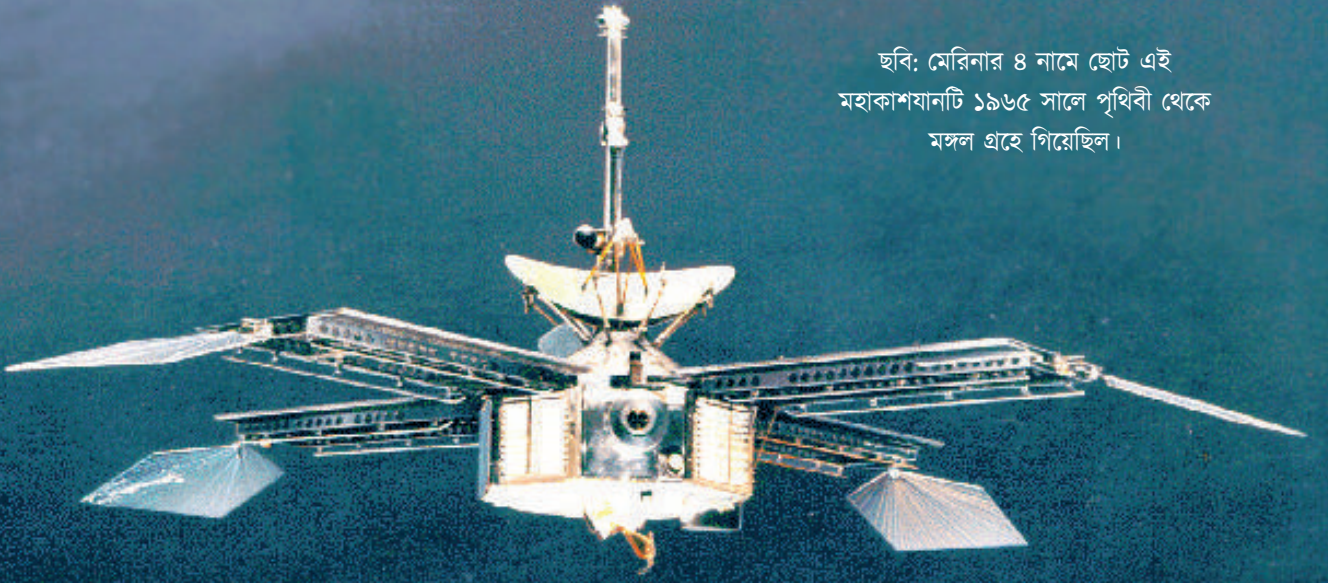
৩.১ সরল গতি (linear motion)

তোমরা হয়তো খবরের কাগজে কিংবা টেলিভিশনের খবরে জেনে থাকতে পারো যে মাঝে মাঝেই পৃথিবী থেকে কোনো একটা মহাকাশযান বহুদূরে কোনো একটি গ্রহে যাত্রা করেছে। কোনো কোনো গ্রহ এত দূরে যে মহাকাশযানকে সেখানে পৌঁছাতে কয়েক বছর সময় লেগে যায়। তোমাদের হয়তো অনেকেরই মনে হচ্ছে এত দূরে যাওয়ার জন্য মহাকাশযানগুলোকে বিশাল পরিমাণ জ্বালানি নিয়ে রওনা দিতে হয়। সে জন্য নিশ্চয়ই মহাকাশযানগুলোর আকারও হয় বিশাল! মহাকাশযানগুলোর ইঞ্জিন এই বিশাল পরিমাণ জ্বালানি জ্বালিয়ে মহাকাশযানকে দূরগ্রহে নিয়ে যায়।

তোমরা যারা এখনো জানো না তারা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবে যে আসলে মহাকাশযানগুলোকে এই দূর গ্রহে যাওয়ার জন্য কোনো জ্বালানি খরচ করতে হয় না। গতির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোনো কিছু যদি সোজা সরলরেখায় সমান বেগে যেতে থাকে, তাহলে সেটা সেভাবেই যেতে থাকবে, সেটাকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো কিছুই করতে হবে না। যদি বস্তুটির গতি বাড়াতে হয় কিংবা কমাতে হয় কিংবা বস্তুর গতিপথ পরিবর্তন করতে হয়, শুধু তাহলে তার ওপর বল প্রয়োগ করার জন্য একটুখানি জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞানের ভাষায় বল বলতে কী বোঝায় আমরা সেটি একটু পরেই জেনে নেবো, আপাতত আমরা বল প্রয়োগ কথাটিকে তার পরিচিত



ছবি: মেরিনার ৪ নামে ছোট এই মহাকাশযানটি ১৯৬৫ সালে পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিল।



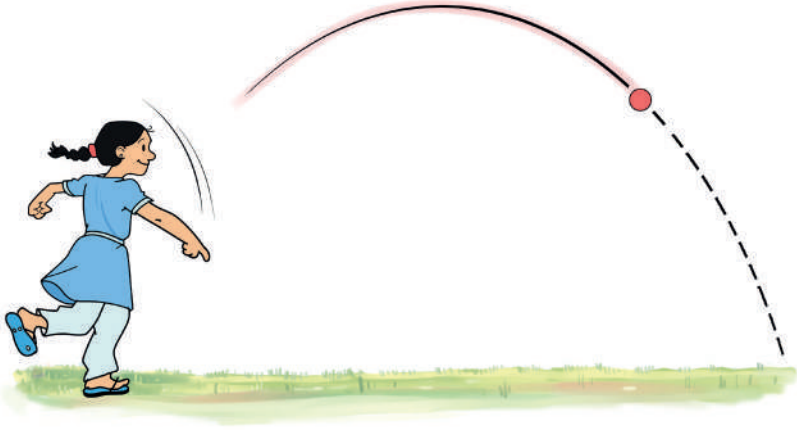
অর্থ—অর্থাৎ কোনো কিছুকে ধাক্কা দেওয়া, টানা বা আকর্ষণ করাকে বুঝে নেবো।

তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে তোমরা সেটা ঘটতে দেখোনা বলে নিশ্চয়ই সবার মনে হচ্ছে, এটি কীভাবে সম্ভব! তোমরা যারা মেঝেতে একটা মার্বেল কিংবা একটি খেলনা গাড়ি গড়িয়ে দিয়েছ, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে গাড়িটি মোটেই সরলরেখার সমবেগে অনন্তকাল ধরে চলছে না। আগে হোক কিংবা পরে হোক মার্বেল কিংবা খেলনা গাড়ি থেমে গেছে। তার কারণ হচ্ছে, মেঝের সঙ্গে ঘর্ষণ কিংবা বাতাসের ঘর্ষণ। তুমি যদি সত্যি সত্যি ঘর্ষণের বল কমিয়ে আনতে পারতে, তাহলে অবাক হয়ে দেখতে মার্বেল কিংবা খেলনা গাড়ি থেমে না গিয়ে চলছে তো চলছেই।

তোমরা যারা সাইকেল চালাও তারা সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে চালানো শুরু করার পর প্রথমে একটু পরিশ্রম করে প্যাডেলে চাপ দিয়ে সাইকেলের বেগটি বাড়াতে হয়। একবার সাইকেলের বেগ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেলে প্যাডেল না করলেও সাইকেল একই বেগে যেতে থাকে। তখন ঘর্ষণের কারণে কমে আসা বেগটুকু ধরে রাখার জন্য মাঝে মাঝে প্যাডেলে চাপ দিয়েই সাইকেল চালানো যায়।

যারা গাড়ি, বাস বা ট্রাক চালায় তাদের সঙ্গে কথা বললেও তোমরা জানতে পারবে যে তারা যখন প্রথম স্থির অবস্থা থেকে গাড়ির বেগ বাড়াতে থাকে, তখন ইঞ্জিনের অনেক পেট্রোল ডিজেল কিংবা গ্যাস খরচ করতে হয়। যখন গাড়ি, ট্রাক বা বাসের গতিবেগ তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে সেই গতিবেগকে ধরে রাখার জন্য খুবই অল্প পেট্রোল, ডিজেল বা গ্যাস খরচ করতে হয়। কাজেই তোমরা গতির একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষত্বের কথা জেনে গেছ আর সেটি হচ্ছে:

কোনো কিছু সরলরেখায় সমান বেগে যেতে থাকলে সেটি সেভাবেই যেতে থাকবে শুধু বেগ বাড়াতে কিংবা কমাতে হলে, কিংবা বেগের দিকের পরিবর্তন করতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে।



ছবি: কোনো একটা কিছু উপরে ছুড়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণ
বলের জন্য বাঁকা হয়ে নিচে পড়ে।

৩.২ বক্রগতি (curve motion)

তোমাকে যদি কেউ বলে, তুমি মেঝেতে একটা মার্বেল এমনভাবে গড়িয়ে দেবে যেন সেটা সোজা না গিয়ে বাঁকা একটা গতিপথে যায়, তাহলে তুমি দেখবে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তুমি যতই চেষ্টা করো মার্বেলটা সোজা পথে যাবে। তোমরা নিশ্চয়ই এখন কারণটা নিজেরাই বুঝে গেছ, মার্বেলটাকে বাঁকা পথে পাঠাতে হলে তার ওপর বল প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু ফাঁকা মেঝেতে মার্বেলটা গড়িয়ে দেওয়ার পর তার ওপর কোনো কিছু বল প্রয়োগ করতে পারে না।

তবে একটা বস্তুকে বক্রগতিতে চালানোর একটা খুব সহজ পদ্ধতি আছে। তুমি যদি কোনো কিছুকে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে উপরে ছুড়ে দাও, তাহলে দেখবে, সেটা সোজা সরল পথে না গিয়ে একটা বাঁকা পথে যাচ্ছে অর্থাৎ তার মধ্যে একটা বক্রগতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার কারণটাও বুঝতে পারছ। তুমি যখন কোনো কিছু ছুড়ে দাও তখন তার উপর মধ্যাকর্ষণ বল নিচের দিকে কাজ করে এবং সেই কারণে বস্তুটা সোজা সরল পথে না গিয়ে একটা বাঁকা পথে যায়।

৩.৩ ঘূর্ণনগতি (circular motion)

বক্রগতির আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ঘূর্ণনগতি। তুমি একটা ছোট পাথরকে সুতা দিয়ে বেঁধে মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতে পারো, এটা ঘূর্ণনগতির একটা চমৎকার উদাহরণ। পাথরটি যেহেতু ঘোরার জন্য প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করছে তার অর্থ নিশ্চয়ই তার ওপর বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে। সেই বলটি কোথা থেকে আসছে?

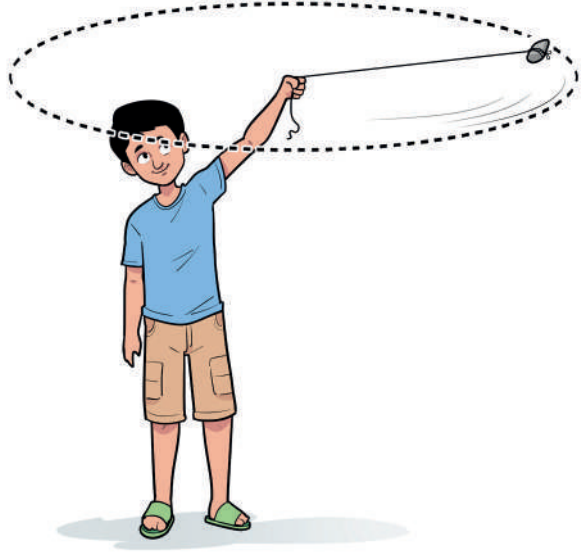
সুতা দিয়ে পাথরটাকে বেঁধে তুমি নিজেই পাথরটাকে টেনে ধরে রেখে তার ওপর কেন্দ্রের দিকে বল প্রয়োগ করছ বলে পাথরটা তোমাকে ঘিরে ঘুরছে। তুমি যদি হঠাৎ সুতাটা ছেড়ে দাও, তাহলে পাথরটার ওপর আর কোনো বল থাকবে না বলে সেটা সোজা ছুটে যাবে, সেটা কিন্তু আর বাঁকাভাবে যাবে না।

তোমরা কি এ রকম ঘূর্ণনগতির আর কোনো উদাহরণ দিতে পারবে? একটি উদাহরণ তোমরা সবাই

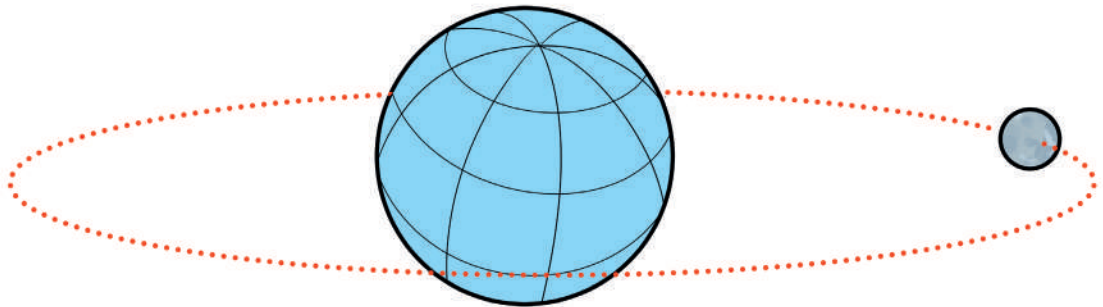
দেখেছ, সেটি হচ্ছে আকাশের চাঁদ। আমরা সবাই আকাশের চাঁদকে সরু একটা রূপ থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ হতে দেখি, তারপর আবার সেটি ধীরে ধীরে সরু হতে হতে অমাবস্যায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রতি ২৯ দিনে একবার করে এই ব্যাপারটি ঘটে, কারণ পুরো পৃথিবীকে একবার পুরোপুরি ঘুরে আসতে চাঁদটির ২৯ দিন সময় লাগে! চাঁদটি সরু দেখাবে নাকি পূর্ণিমার ভরাট চাঁদ দেখাবে, সেটা নির্ভর করে সূর্যের তুলনায় সেটি পৃথিবীর কোন দিকে আছে তার ওপর। পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের এই ঘূর্ণনগতিটি চলমান থাকতে পারে কারণ, পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ বল দিয়ে চাঁদকে নিজের দিকে টেনে

রাখে—ঠিক যে রকম তুমি পাথরের টুকরাকে সুতা দিয়ে বেঁধে তোমার কাছে টেনে রেখেছিলে! ঠিক একইভাবে পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণের কারণে সূর্যকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। আবার সূর্য আমাদের গ্যালাক্সিতে ছায়াপথের কেন্দ্রে থাকা বিশাল ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণে তার কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

তুমি যদি সব সময় তোমার চোখ খোলা রাখো তাহলে আমাদের চারপাশে ঘূর্ণনগতির অনেক উদাহরণ খুঁজে পাবে। এখন থেকে যখনই তুমি এ রকম গতি দেখতে পাবে, সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। এর মধ্যে অনেক মজার বিষয় লুকিয়ে থাকে।



ছবি: একটা ছোট পাথরকে সুতা দিয়ে বেঁধে ঘোরাতে হলে সেটাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে রাখতে হয়।



ছবি: পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল চাঁদকে টেনে ধরে রেখেছে বলে সেটি পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে পারে।



ছবি: দোলনায় দোল খাওয়া হচ্ছে
পর্যাবৃত্ত গতির একটি উদাহরণ

৩.৪ পর্যাবৃত্ত গতি (periodic motion)

আমরা এতক্ষণ সরলগতি, বক্রগতি এবং ঘূর্ণনগতির কথা বলেছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই তিনটি গতির পাশাপাশি আরও একটি বিশেষ ধরনের গতি দেখতে পাই, সেটার নাম পর্যাবৃত্ত গতি, এই গতিটিকে খুব সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। তুমি যখন দোলনায় দুলতে থাকো সেটি হচ্ছে পর্যাবৃত্ত গতির একটা উদাহরণ। পুকুরের ভেসে থাকা কচুরিপানা যখন একটা ঢেউয়ের কারণে উপরে নিচে যেতে থাকে, সেটি হচ্ছে পর্যাবৃত্ত গতির আরেকটি উদাহরণ। আবার একটা স্প্রিংয়ের সঙ্গে একটা ভর যুক্ত করে সেটাকে নিচে টেনে ছেড়ে দিলে যখন সেটা উপর-নিচ করতে থাকে, সেটাও পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ। অর্থাৎ কোনো গতিশীল বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা বল নিয়মিতভাবে দিক পরিবর্তনের কারণে যখন তার গতির পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তখন তাকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে। পর্যাবৃত্ত গতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার একটা দোলনকাল থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য সেই দোলনকাল সব সময় নির্দিষ্ট থাকে, সেটাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। দোলনকাল পরিবর্তন করতে হলে সেই অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় তুমি যদি একটা ৩০ cm সুতার সঙ্গে ছোট একটা পাথর বেঁধে বুলিয়ে দাও, তাহলে দেখবে সেটি মোটামুটি এক সেকেন্ডে ডান থেকে বামে গিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে। তুমি জোরে বা আশ্বে দুলিয়ে দিয়ে যত চেষ্টাই করো, সেটি সবসময় পুরো একবার দুলতে এক সেকেন্ড সময় নেবে। যদি সুতার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করো শুধু তাহলে তুমি দোলনকালটার পরিবর্তন করতে পারবে।

তোমরা যখন উপরের ক্লাসে যাবে তখন পর্যাবৃত্ত গতি সম্পর্কে আরও বিষয় জানতে পারবে। আপাতত তুমি শুধু এর গুরুত্বপূর্ণ অংশটা মনে রেখ, যেহেতু পর্যাবৃত্ত গতিতে একটি বস্তুর গতির পরিবর্তন হয়, কাজেই তার অর্থ যে বলটি বস্তুকে গতিশীল করছে, সেই বলটিরও দিক পরিবর্তন হয়।

তোমরা কি উপরের উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করে বস্তুর ওপর কী বল কাজ করছে এবং কীভাবে দিক পরিবর্তন করছে, সেটি অনুমান করতে পারবে?

৩.৫ বেগের পরিমাপ

একটি নির্দিষ্ট সময় একটি বস্তু কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে, সেটি থেকে আমরা বস্তুটির বেগ পরিমাপ করতে থাকি। একটা গাড়ি যদি এক ঘণ্টায় ৩৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে তার বেগ v আমরা ইচ্ছা করলে মিটার এবং সেকেন্ডে প্রকাশ করতে পারি।

$$v = \frac{৩৬ \times ১০০০}{৬০ \times ৬০} \frac{\text{মিটার}}{\text{সেকেন্ড}} = ১০ \text{ মিটার প্রতি সেকেন্ডে}$$

পাশের ছকে বিভিন্ন যানবাহনের প্রতি ঘণ্টায় সম্ভাব্য বেগ দেওয়া হয়েছে।

এখানে তোমাদের একটি বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া যাক, আমরা ইচ্ছা করলেই কিন্তু একটি বস্তুর গতিবেগ অনির্দিষ্টভাবে বাড়তে পারব না। একটি বস্তুর সর্বোচ্চ একটি বেগ রয়েছে, বস্তুর বেগ তার থেকে বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়। সেই বেগটি হচ্ছে আলোর বেগ। আলোর বেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার।

যানবাহন	বেগ (কিমি প্রতি ঘণ্টায়)
সাইকেল	২০
গাড়ি	১০০
প্লেন	৮০০
রকেট	৩০,০০০

৩.৬ ত্বরণ (acceleration)

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে চলমান একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা না হলে বস্তুটি সমবেগে সরলরেখায় যেতে থাকে। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, একটা বস্তুর বেগ পরিবর্তন করতে হলে বল প্রয়োগ করতে হয়। তোমরা এটাও জেনে গেছ, বস্তুর বেগ দুভাবে পরিবর্তন করা যায়। যদি সরলরেখায় গতিশীল হয় তাহলে বস্তুর বেগ বাড়িয়ে বা কমিয়ে এবং গতিশীল বস্তুর দিক যদি পরিবর্তন হয়, তাহলেও তার বেগের পরিবর্তন হয়।

বস্তুর বেগের পরিবর্তন করার জন্য যেহেতু বল প্রয়োগ করতে হয়, তাই বলকে ভালোভাবে বোঝার জন্য বেগের পরিবর্তন খুব ভালোভাবে বুঝতে হয়। সে জন্য বেগের পরিবর্তনের জন্য আলাদা একটা নামকরণ হয়েছে, সেটি হচ্ছে ত্বরণ। যখনই বেগের পরিবর্তন হয়, আমরা বলে থাকি ‘ত্বরণ’ হয়েছে। সরলরেখার গতিশীল বস্তুর ত্বরণ কীভাবে পরিমাপ করা যায় আমরা এখন সেটি দেখব। দিক পরিবর্তন হলে কিংবা বক্ররেখায় গতিশীল বস্তুর ত্বরণ আমরা উপরের ক্লাসে জেনে নেবো।

কতটুকু সময়ে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে, সেখান থেকে আমরা যেরকম বেগ বের করেছি ঠিক সেইভাবে কতটুকু সময়ে কতটুকু বেগের পরিবর্তন হয়েছে, সেখান থেকে আমরা ত্বরণ বের করতে পারি। অর্থাৎ,

$$\text{ত্বরণ} = \frac{\text{শেষবেগ} - \text{আদিবেগ}}{\text{অতিক্রান্ত সময়}}$$

ত্বরণ যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে বুঝতে হবে গতিবেগ আসলে কমে যাচ্ছে। কমে যাওয়া বোঝানোর জন্য অনেক সময় আমরা ‘মন্দন’ কথাটা ব্যবহার করি।

সন্ধানিনী ?

- ১। বইয়ের উদাহরণের বাইরে তুমি কি কোনো সরল, বক্র, ঘূর্ণন এবং পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ দিতে পারবে?
- ২। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি ৬০০০ কিমি হয় তাহলে প্লেনে চড়ে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে কত সময় লাগবে? আর রকেটে চড়ে?



ଅଧ୍ୟାୟ ୪
ପଦାର୍ଥ ଓ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

সর্ধ্য্য

৪

পদার্থ ও তার বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ পদার্থ ও পদার্থের ধর্ম
- ☑ ভর ও আয়তনের জ্ঞান
- ☑ ভর ও ওজনের পার্থক্য
- ☑ ঘনত্ব, বিভিন্ন তরলের ঘনত্বের তুলনা
- ☑ ভাসা ও ডোবা
- ☑ পদার্থের অবস্থাসমূহ: পদার্থের তিনটি অবস্থা (কঠিন, তরল, বায়বীয়) এবং তাদের বৈশিষ্ট্য
- ☑ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যবহার
- ☑ পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

৪.১ পদার্থ

পদার্থ কী?

তুমি যা কিছু দেখতে পাও এবং স্পর্শ করতে পারো তার সবকিছুই পদার্থ! আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত আছে শুধু সেই জিনিসগুলোকে আমরা সাধারণত বস্তু বা পদার্থ বলে থাকি, কিন্তু আসলে মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তার অধিকাংশই পদার্থ। পরিচিত পদার্থের কিছু উদাহরণ হলো কলম, পানি, বাতাস কিংবা দুধ। মহাজগতে পদার্থ ছাড়া যা আছে, সেগুলো হচ্ছে শক্তির বিভিন্ন রূপ, যেমন: আলো, তাপ, কিংবা শব্দ। পদার্থের ভর এবং আয়তন আছে। তোমাদের মনে হতে পারে বাতাসের বুঝি ভর কিংবা আয়তন নেই, কিন্তু তোমরা দেখবে আসলে বাতাসেরও ভর এবং আয়তন আছে।



ছবি: পদার্থের
কিছু উদাহরণ

৪.১.১ ভর (mass):

ভর হলো একটি বস্তুতে পদার্থের মোট পরিমাণ। ছবিতে দেখানো দাঁড়িপাল্লাটি দেখে তোমরা ভর কী তা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাবে। যদি এই দাঁড়িপাল্লার দুই দিক একই উচ্চতায় থাকে তবে এর অর্থ হবে যে ডান পাল্লায় থাকা টমেটোতে বাম পাল্লাতে থাকা বাটখারার সমান ভর রয়েছে। যদি বাটখারাটি ১ কেজি ভরের সমান হয়ে থাকে তাহলে টমেটোর ভরও হবে ১ কেজি। তোমরা আগের অধ্যায়েই পড়ে এসেছ যে, ভরের আন্তর্জাতিক একক হলো কিলোগ্রাম (kg)।



৪.১.২ আয়তন (volume):

একটি বস্তু যে পরিমাণ জায়গা দখল করে তার পরিমাপ হচ্ছে আয়তন। কোনো বস্তুর আয়তন কীভাবে পরিমাপ করা হবে তা সাধারণত ঐ পদার্থের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আয়তনের আন্তর্জাতিক একক হলো ঘনমিটার (m^3), কিন্তু ক্ষুদ্র আয়তন ঘন সে.মি. (cm^3 বা cc) একক দিয়ে পরিমাপ করা যেতে পারে। তরল পদার্থের আয়তন সাধারণত লিটারে (l) মাপা হয়। কম আয়তন হলে মিলিলিটারে (ml) পরিমাপ করা যেতে পারে। এক লিটার আসলে ১ হাজার ঘন সে.মি. আয়তনের সমান।

৪.১.৩ ঘনত্ব (density):

ঘনত্ব বলতে মূলত একক আয়তনের মধ্যে কতটুকু ভর আছে তা বোঝায়। ভর সম্পর্কে তোমরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছ। একটা উদাহরণ চিন্তা করা যাক! ধরো, একটা বাক্স বা স্যুটকেসে তুমি একদম ঠাসাঠাসি করে জামাকাপড় রাখলে। এখন এই বাক্সের তো একটা নির্দিষ্ট ঘনত্ব আছে। বাক্সের ভর পরিমাপ করে এর আয়তন দিয়ে ভরকে ভাগ করলে যা আসবে সেটাই হলো এই বাক্সের ঘনত্ব। এখন যদি বাক্স থেকে দু-তিনটা জামা বের করে নাও, বাক্সের ভর তো একটু কমে যাবে, তাই না? কিন্তু বাক্সের আয়তন তো আর পাল্টাচ্ছে না। কাজেই এখন যদি আবার এর আয়তন দিয়ে ভরকে ভাগ করা হয় ঘনত্ব আগের হিসাবের চেয়ে কম আসবে। অর্থাৎ, বাক্সের ঘনত্ব আগের চেয়ে কম!

তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে? যত কম জায়গায় বস্তুর যত বেশি পরিমাণ ভর থাকবে সেটি তত বেশি ঘন। কাজেই বলা যায়, ঘনত্ব বস্তুর একটি ভৌতধর্ম যেটা তার ভর এবং আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। যেহেতু প্রত্যেক বস্তুরই আলাদা আলাদা ঘনত্ব রয়েছে, সেজন্য ঘনত্বের মাধ্যমে অনেক বস্তুকে শনাক্ত করা যায়। তুমি এক টুকরা লোহা হাতে নিলে সেটা বেশ ভারি মনে হবে, কিন্তু সমান আয়তনের এক টুকরা কাঠ হাতে নিলে সেটাকে এত ভারি মনে হবে না। তার কারণ লোহার ঘনত্ব বেশি এবং কাঠের ঘনত্ব কম।

সাধারণভাবে, কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ থেকে বেশি ঘন এবং তরল পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থের চেয়ে বেশি ঘন। এর কারণ হলো কঠিন পদার্থের কণাগুলো একে অপরের অনেক কাছাকাছি থাকে, অপরদিকে

তরল পদার্থের কণাগুলি একে অপরের চারপাশে চলাচল করতে পারে, আবার গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কণাগুলি যত বড় জায়গাই দেওয়া হোক, পুরো জায়গা জুড়েই চলাচলের জন্য মুক্ত থাকে।

তুমি যদি কোনো বস্তুর ভর এবং তার আয়তন জানো তাহলে ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ দিয়ে বস্তুর ঘনত্ব বের করতে পারবে। অন্যভাবে বলা যায় বস্তুর ঘনত্ব হচ্ছে এক ঘন সেন্টিমিটার (cm^3 বা cc) আয়তনের ভরের সমান।

ঘনত্বের একক হলো গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটার, যা g/cm^3 কিংবা g/cc আকারেও লেখা হয়। লোহার ঘনত্ব 9.8 গ্রাম/ ঘন সে.মি. (g/cm^3)। এর অর্থ হলো প্রতি ঘন সেন্টিমিটার লোহার ভর 9.8 গ্রাম (g)।

তোমরা যদি কোনো বস্তুর ভর (m) ও আয়তন (V) জেনে থাকো, তাহলে নিচের সমীকরণের সাহায্যে বস্তুর ঘনত্ব (গ্রিক অক্ষর ρ , উচ্চারণ রো) বের করতে পারবে।

$$\rho = m/V$$

বস্তুর ভর m , গ্রামে (g) এবং বস্তুর আয়তন V ঘন সেন্টিমিটারে (cm^3) লেখা হলে বস্তুর ঘনত্ব ρ বের হবে g/cm^3 এককে।

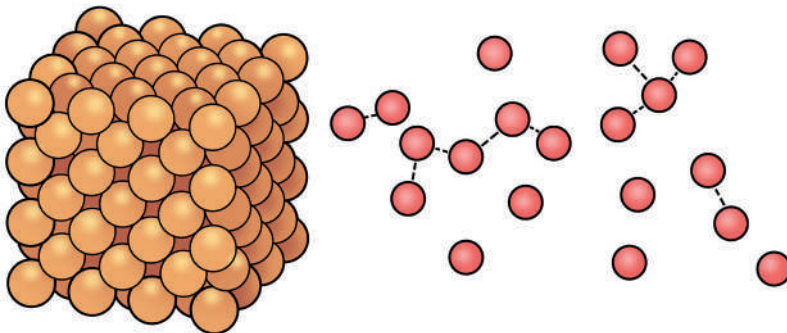
যদি একটি আম গাছের গুড়ির আয়তন হয় 2500 ঘন সে. মি. (cm^3) এবং ভর 1500 গ্রাম (g), তাহলে, আম গাছের কাঠের ঘনত্ব হবে = 1500 গ্রাম (g) / 2500 ঘন সে.মি. (cm^3) = 0.6 গ্রাম/ ঘন সে.মি. (g/cm^3)।



কোনো বস্তুর ঘনত্ব দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

- বস্তুটি যে কণাসমূহ দিয়ে তৈরি তার ভর
- বস্তু কতটা ঘনভাবে সন্নিবেশিত তার উপর

উদাহরণস্বরূপ, সোনার কণার ভর অনেক বেশি এবং ঘনভাবে সন্নিবেশিত কণা দিয়ে গঠিত, তাই সোনার ঘনত্ব বেশি। আবার আমরা জানি যেকোনো গ্যাসের কণাসমূহ পুরো আয়তন দখলের জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এতে কণাগুলোর মধ্যে প্রচুর খালি জায়গা থাকে, তাই গ্যাসের ঘনত্ব কম।



ছবি: সোনা এবং গ্যাসের গঠন



নিম্নে বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্বের তুলনা করা হলো।

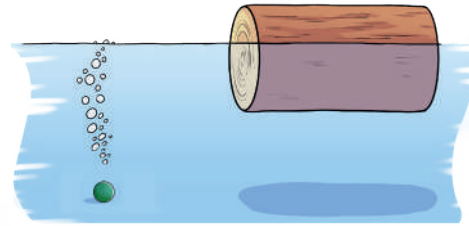
পদার্থ	ঘনত্ব (g/cm^3)	পদার্থ	ঘনত্ব (g/cm^3)
বায়ু	০.০০১২৯	পানি	১.০০
কর্ক	০.২৫	লোহা	৭.৮০
গ্লিসারিন	১.২৬	রুপা	১০.৫০
বরফ	০.৯২	সোনা	১৯.৩০

ছক: কয়েকটি পদার্থ ও তাদের ঘনত্ব

ভাসা ও ডোবা

ভাসা ও ডোবা ধাঁধার মতো হতে পারে:

- ? কেন একটি একটি ছোট মার্বেল পানিতে ডুবে যায়?
- ? কেন একটি বড় আম কাঠের গুড়ি পানিতে ভাসে?



তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে, একটা বস্তুর ভাসা ও ডোবা সেই বস্তুটির ভরের উপর নির্ভর করে না, তার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। মার্বেলের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে বেশি, যার কারণে সেটি পানিতে ডুবে যায় এবং কাঠের গুড়িটির ঘনত্ব পানির চেয়ে কম হওয়ায় সেটি ভাসে।



মজার তথ্য

- » সমুদ্রের পানি সাধারণ পানির চেয়ে বেশি ঘন। যার কারণে পুকুরের চেয়ে সমুদ্রে ভেসে থাকা সহজ!
- » মধ্যপ্রাচ্যের ডেড সি নামে সমুদ্রের পানির ঘনত্ব এত বেশি যে সেখানে সাঁতার না কেটেই ভেসে থাকা যায়!

সম্ভ্রান্তনী

?

- ১। কোনো বস্তুর ঘনত্ব ১ গ্রাম/ ঘন সে .মি. (g/cm^3) বলতে কী বোঝ?
- ২। কারণ লেখো: উত্তপ্ত বাতাসের বেলুন কীভাবে কাজ করে?
(মনে রেখো, উত্তপ্ত বাতাসের ঘনত্ব কিন্তু শীতল বাতাসের চেয়ে আলাদা।)

৪.২ পদার্থের অবস্থাসমূহ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ধরনের পদার্থ ব্যবহার করি। যেমন শুধু রান্না করার জন্য কখনো মাটির চুলায় কাঠ ব্যবহার করা হয়, কেরোসিনের চুলায় কেরোসিন ব্যবহার করা হয়, আবার গ্যাসের চুলায় গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ,

- ☑ আগুন জ্বালানোর কাঠ একটি কঠিন পদার্থ।
- ☑ পানি একটি তরল পদার্থ।
- ☑ প্রাকৃতিক গ্যাস একটি গ্যাসীয় পদার্থ।

অর্থাৎ সহজভাবে আমরা বলতে পারি পদার্থের তিনটি অবস্থা হচ্ছে, কঠিন, তরল এবং বায়বীয়।

৪.২.১ কঠিন অবস্থা এবং কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য

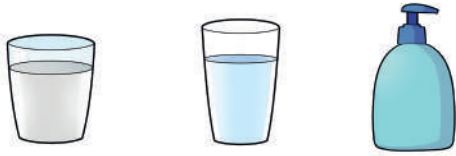
তোমরা তোমাদের চারপাশে নানা রকম কঠিন পদার্থ দেখেছ, কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ একটি কঠিন বস্তুর আয়তনের পরিবর্তন হয় না এবং তার আকারেরও পরিবর্তন হয় না। যেহেতু বস্তুটি কঠিন তাই তার আকারের পরিবর্তন করতে হলে সেটার উপর নানা ধরনের বল প্রয়োগ করতে হয়।



ছবি: কঠিন পদার্থের উদাহরণ

৪.২.২ তরল অবস্থা এবং তরলের বৈশিষ্ট্য

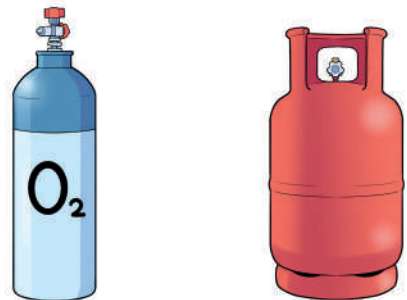
তোমরা সবাই তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে পানি, তেল কিংবা দুধের মতো তরল পদার্থ ব্যবহার করেছ। নিশ্চয়ই জেনে গেছ যে, তরল পদার্থের আয়তন পরিবর্তন না হলেও তার কিন্তু কঠিন পদার্থের মতো নিজের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। তাকে যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।



ছবি: তরল পদার্থের উদাহরণ

৪.২.৩ গ্যাসীয় অবস্থা এবং গ্যাসের বৈশিষ্ট্য

আমাদের চারপাশে বাতাস। সেই বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেই। অনেক গাড়ি প্রাকৃতিক গ্যাস বা সিএনজিতে চালানো হয়। কেতলিতে পানি ফুটানো হলে সেখান থেকে বাষ্প বের হয়। এইসবই হচ্ছে বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের উদাহরণ। কঠিন এবং তরল দুই ধরনের পদার্থেরই আয়তন নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু গ্যাসের জন্য সেটা সত্যি নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস একটা ছোট পাত্রে রাখা হলে সেটি সাথে সাথে সারা পাত্রে ছড়িয়ে পড়ে, তার আয়তন হয় পাত্রটির



ছবি: বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের উদাহরণ

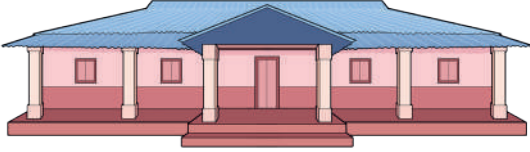
সমান। আবার সেই একই পরিমাণ গ্যাস একটি বড় পাত্রে রাখা হলে সেটি সাথে সাথে পুরো বড় পাত্রে ছড়িয়ে পড়বে, তার আয়তন হবে বড় পাত্রের সমান।

৪.২.৪ কঠিন, তরল ও গ্যাসের ব্যবহার

কঠিন, তরল, এবং গ্যাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলাদা হওয়ায় তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

কঠিন পদার্থের কিছু ব্যবহার

কঠিন পদার্থসমূহ দৃঢ় হওয়ায় এদের আকৃতি সবসময় একই থাকে। যার ফলে এদেরকে বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি, জাহাজ নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

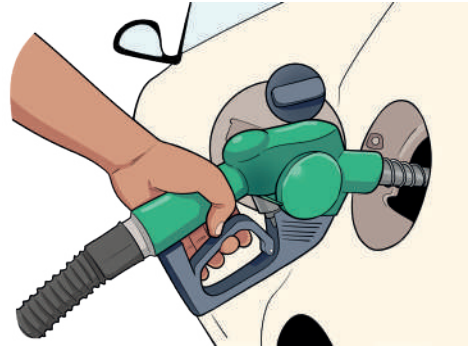


ছবি: একটি ঘর ও একটি নৌকা, যা নির্মাণে কঠিন পদার্থসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।



তরল পদার্থের ব্যবহার

তরল পদার্থ যেমন পানি এবং তেল আমাদের প্রত্যহ জীবনে খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পানি সাধারণত তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। দিঘি, নদী, পুকুর, খাল, নালা, সমুদ্রে তরল পানি দেখতে পাওয়া যায়। তেল মোটর গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



ছবি: মোটর গাড়ির জ্বালানি হিসেবে তেল ব্যবহার করা হয়।



ছবি: অগ্নিনির্বাপক কার্বন ডাই অক্সাইড সিলিন্ডার এবং বাতাসের সাহায্যে ফুটবল ফুলানো।

গ্যাসীয় পদার্থের ব্যবহার

গ্যাসসমূহকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন, অক্সিজেন গ্যাস চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বাতাসের সাহায্যে ফুটবল ফুলানোও গ্যাসেরই একটি ব্যবহার।

৪.৩ পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে অনেক পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়, আবার আমরা আমাদের প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের পরিবর্তন করি। পদার্থের পরিবর্তন দুই প্রকার: ভৌত পরিবর্তন এবং রাসায়নিক পরিবর্তন। নাম শুনেই বুঝতে পারছ, ভৌত পরিবর্তন একটি পদার্থের ভৌত বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে এবং একটি রাসায়নিক পরিবর্তন তার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। ভৌত পরিবর্তন সাধারণত উভমুখী হয় যেমন, কোনো বস্তুকে গরম করে উত্তপ্ত করে রাখা আবার শীতল করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে উভমুখী হলেও সাধারণত একমুখী হয়ে থাকে।

৪.৩.১ ভৌত পরিবর্তন

একটি ভৌত পরিবর্তন
একটি পদার্থকে

মৌলিকভাবে ভিন্ন

পদার্থে পরিণত করে না।

উদাহরণস্বরূপ, কিছু ফলের
মিশ্রণ তৈরি করার পদ্ধতিতে

দুটি বাহ্যিক পরিবর্তন জড়িত:

তা হলো প্রতিটি ফলের আকৃতির

পরিবর্তন এবং ফলের বিভিন্ন

টুকরো একসাথে মিশ্রিত হওয়া।

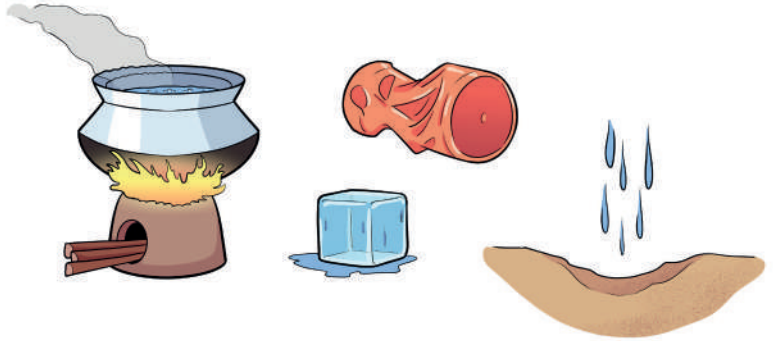
কারণ ফলগুলির উপাদানগুলোর

মিশ্রণের সময় কোনো রাসায়নিক

পরিবর্তন হয় না উদাহরণস্বরূপ

বলা যায়, পানি এবং ফলের

ভিটামিন অপরিবর্তিত থাকে।



ছবি: পানি ফুটানো,
দোমড়ানো, বরফ
গলানো, পানি ও
বালি মেশানো, কাচ
ভাঙা ইত্যাদি ভৌত
পরিবর্তনের উদাহরণ



কাটা, ছিঁড়ে ফেলা, পিষে ফেলা এবং মিশ্রিত করা হলো ভৌত

পরিবর্তন কারণ এগুলোতে আকার পরিবর্তন হয় কিন্তু কোনো উপাদানের গঠন পরিবর্তিত হয়না।

উদাহরণস্বরূপ, চিনি এবং পানির মিশ্রণ একটি পদার্থ, যা তৈরি হয় এদের কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়াই।

৪.৩.২ রাসায়নিক পরিবর্তন

রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে একটি পদার্থ তার উপাদানগুলির গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নতুন একটি পদার্থে পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক বিক্রিয়া হিসেবেও পরিচিত।



পচানো, পোড়ানো, রান্না করা এবং মরিচা ধরা হলো আরও কয়েক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ তারা এমন পদার্থ তৈরি করে যা সম্পূর্ণ নতুন রাসায়নিক পদার্থ। উদাহরণস্বরূপ, কাঠ পোড়ালে ছাই, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানিতে পরিণত হয়।

ছবি: কাঠ পোড়ানো, ফল পচে যাওয়া, মরিচা পড়া, ব্যাটারির ব্যবহার, খাবার হজম হওয়া, দুধ টক হয়ে যাওয়া, রান্না করা, সালোকসংশ্লেষণ ইত্যাদি রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ



ଅଧ୍ୟାୟ ୫
ଜୀବଜଗତ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ জীবজগতের বৈচিত্র
- ☑ জীবের ক্ষুদ্রতম একক কোষ এবং তার গঠন
- ☑ জীবের শ্রেণিবিন্যাস

৬.১ কোষ

কখনো কী তোমার হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছ এগুলো কী দিয়ে তৈরি? অথবা ওই যে স্কুলের আঙিনায় বড় গাছটি, কিংবা পরিচিত পুকুর বা ড্রাইংরুমের অ্যাকুরিয়ামের মাছগুলো—এরাই বা কীভাবে তৈরি হলো এমন আকার আর আকৃতিতে?

আমাদের চারপাশের যা কিছু দেখি তাদের মধ্যে যাদের জীবন আছে তারাই বিজ্ঞানের পরিভাষায় জীব হিসেবে পরিচিত। সব জীবকে আমরা দেখতে পাই না। উপরে যাদের কথা বললাম—তাদেরকে আমরা খালি চোখেই দেখি। আর কেউ কেউ আছে যাদেরকে আমরা খালি চোখে দেখি না। এদেরকে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। একটু পরেই আমরা এই যন্ত্র সম্বন্ধে জানব।

তোমার স্কুলের ভবনটির কথা ভাবো। একতলা হোক বা পাঁচতলা, এই ভবনটি কিন্তু তৈরি হয়েছে একের পর এক ইট গেঁথে। তাই ইটগুলোকে আমরা বলতে পারি ভবন তৈরির একক। ঠিক এমনিভাবে আমাদের জানা অজানা যত ছোট ও বড় জীব আছে তাদেরও গঠনের মূলে রয়েছে কিছু গাঠনিক একক। তোমার সম্পূর্ণ শরীর, প্রিয় পোষা প্রাণী কিংবা মাঠের গাছ সবকিছুর গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ওই এককসমূহ।

বিজ্ঞানের ভাষায় জীবের আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রতম একক যা জীবদেহের গঠন ও কাজে যুক্ত থাকে তাকেই কোষ বলা হয়। আমরা এ সম্বন্ধে আরো কিছু বিষয় জেনে নেবো এই অধ্যায়ে।

অনেক জীব আছে যারা কেবল একটি কোষ নিয়েই গঠিত। এদেরকে আমরা বলি এককোষী জীব। এককোষী (unicellular) জীবদেহের সমস্ত জৈবিক কাজ একটি কোষের মধ্যেই হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া (একবচনে Bacterium এবং বহুবচনে Bacteria) এবং প্রোটোজোয়া (Protozoa) এককোষী জীবের উদাহরণ। এককোষী জীব হলো সরলতম জীব।

আর একটু আগে যে বড় বড় জীবের উদাহরণ তোমরা দেখেছিলে (মাছ, গাছ, মানুষ), এরা তৈরি হয় বহু কোটি কোষ দিয়ে। তাই এদেরকে বলা হয় বহুকোষী (multicellular) জীব।

কোষ সম্বন্ধে আমাদের এই যে ধারণা, তা কিন্তু খুব বেশি আগে জানা ছিলো না।

চারপাশের নানান জীব কী দিয়ে, কীভাবে গঠিত হয়, বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে এই প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করেছেন। জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি উপায় বের করার জন্য বহু বিজ্ঞানী প্রচেষ্টা চালান। এভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় মাইক্রোস্কোপ



ছবিতে ব্যাকটেরিয়া

(microscope) বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এর ফলে খালি চোখে দেখা যায় না এমন অত্যন্ত ছোট জীবকেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। ষোড়শ শতাব্দীর সেই প্রথম দিককার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে আজকের যুগের যন্ত্রগুলো অনেক উন্নত ধরনের এবং দিনদিন জীবজগতের নতুন সব রহস্য উন্মোচন করছে। ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বৃহত্তম বট গাছ বা অতিকায় নীল তিমি পর্যন্ত সমস্ত জীবদেহের গঠন ও জৈবিক কাজের মূলে রয়েছে কোষ। মানবদেহে প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন (সাইত্রিশ লক্ষ কোটি বা ৩৭,০০০,০০০,০০০,০০০) সংখ্যক কোষ দিয়ে তৈরি।

বৃহদাকার জীবদেহেও ছোট আকারের অসংখ্য কোষ থাকে। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তুমি যদি বিভিন্ন কোষের দিকে তাকাও, দেখতে পাবে যে বিভিন্ন কোষের আকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। কিছু কোষ লম্বাকৃতির, কিছু দেখতে গোলাকার কিংবা দণ্ডাকার, আবার কিছু দেখতে হয়তো ব্যাঙাচির মতো। কিছু কোষ আছে যার কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, অর্থাৎ এদের আকৃতি পরিবর্তনশীল।

জীবজগতের অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তিক বিভিন্ন কাজে কোষগুলো যুক্ত থাকে। কাজের উপর ভিত্তি করে বহুকোষী জীবে কোষের আকৃতি নানা রকমের হয়ে থাকে। বহুকোষী একটি জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সব ধরনের কোষেরই সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, একটি জীবদেহে সকল কোষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

বহুকোষী জীবগুলোও কিন্তু একটি কোষ থেকেই তৈরি হয়। যেমন, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের যে ৩৭ ট্রিলিয়ন কোষ, তাদের শুরু কিন্তু হয়েছিল একটিমাত্র কোষ থেকে—যার নাম অবিভক্ত বা আদি ভ্রূণ কোষ বা জাইগোট (zygote)। এই একটি জাইগোট কীভাবে শেষ পর্যন্ত ট্রিলিয়ন কোষের বিরাট সংখ্যায় পরিণত হলো? এর উত্তর জানা যাবে কোষের বিভাজন প্রক্রিয়ার বিষয়টি জানলে।

বহুকোষী জীবের একটি পরিণত দেহকোষ এক পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি কোষ তার জেনেটিক উপাদানসহ সমস্ত উপাদান দ্বিগুণ করে দুটি অভিন্ন কোষ গঠনের জন্য বিভক্ত হয়। প্রতিটি

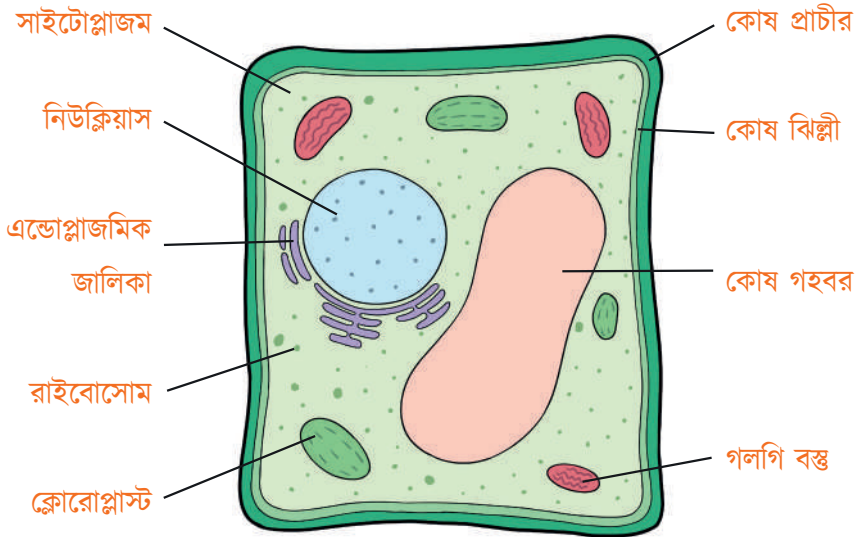
ভাগেই সকল উপাদান সমানভাবে চলে আসে। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি কোষ থেকে দুটি, দুটি কোষ থেকে চারটি, চারটি কোষ থেকে আটটি, আটটি কোষ থেকে ষোলটি—এভাবে নতুন নতুন কোষ তৈরি হয়। এভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবের শরীরের বৃদ্ধি ঘটে।

ধরো, তোমার দেহে এখন ২০ ট্রিলিয়ন (বিশ লক্ষ কোটি, অর্থাৎ 2×10^{13}) কোষ আছে। সবসময় কিন্তু এত কোষ তোমার দেহে ছিল না। আমরা প্রত্যেকেই একটি কোষ হিসেবে জীবন শুরু করেছি। সেই কোষটি বিভাজিত হয়েছে, আকার-আকৃতিতে বেড়েছে, এবং এক সময় আবার বিভাজিত হয়েছে। আমরা সেই শিশুকাল থেকে বড় হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছি কারণ আমাদের কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হয়েছে।



প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের তিনটি প্রধান কাঠামো রয়েছে: নিউক্লিয়াস (nucleus), কোষ ঝিল্লি (cell or plasma membrane) এবং সাইটোপ্লাজম (cytoplasm)। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন—ব্যাকটেরিয়া কোষ, যার কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই, সুগঠিত নিউক্লিয়াস না থাকায় এদের বলা হয় প্রোক্যারিয়ট (Prokaryote) বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ। অপরদিকে, যেসব কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে তাদের বলা হয় ইউক্যারিয়ট (Eukaryote) বা সুকেন্দ্রিক কোষ। নিউক্লিয়াস সাধারণত গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হয়। এটি কোষের কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। নিউক্লিয়াস

একটি কোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেহের মস্তিষ্ক যেমন সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ধারণ করে, নিউক্লিয়াসও তেমনি কোষের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সমস্ত জৈবিক কাজ পরিচালনার তথ্য নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকা ডিএনএ (DNA)-এর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে।



ছবি: উদ্ভিদকোষ

নিউক্লিয়াসের নিজস্ব ঝিল্লি বা আবরণ (nuclear membrane) আছে, যা একে সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ থাকে। একে কোষঝিল্লি বলা হয়। কোষঝিল্লি কোষকে ঘিরে রাখে এবং কোষের ভিতরে ও বাইরের বিভিন্ন পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। কোষঝিল্লি নমনীয় হয়। তবে উদ্ভিদ কোষে কিন্তু এই ঝিল্লিটির চারদিকে আরো একটি তুলনামূলক শক্ত আবরণ থাকে। একে কোষপ্রাচীর (cell wall) বলা হয়। কোষপ্রাচীরের জন্যই উদ্ভিদ কোষ তুলনামূলকভাবে একটু শক্ত হয়ে থাকে। কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষকে আকৃতিও প্রদান করে। প্রাণীকোষে কোনো কোষপ্রাচীর থাকে না। উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরের একটি প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ (cellulose)। সেলুলোজ একটি নির্জীব উপাদান যা কোষকে রক্ষা করে এবং আকৃতি প্রদান করে। কাঠের প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ। শুধু উদ্ভিদ কোষেই সেলুলোজ থাকে। প্রাণীকোষে কোনো সেলুলোজ থাকে না।

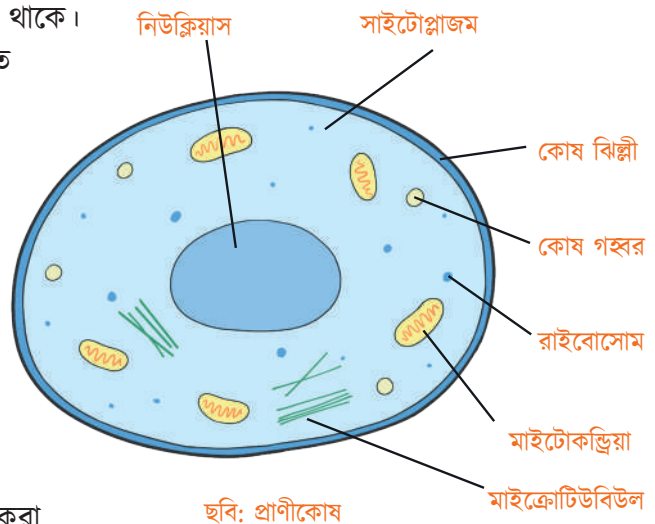
আমরা শুরুর দিকে কোষের বিভিন্ন আকার আকৃতি নিয়ে কথা বলেছি। কোষ কীভাবে তার আকৃতি ঠিক রাখে? এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আগে তোমাদের মনে করিয়ে দিই—আমাদের দেখা প্রাণীদের গঠন এবং আকৃতির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে তাদের কঙ্কাল। যেমন, মানবদেহে কঙ্কাল না থাকলে এমন সুনির্দিষ্ট গঠন থাকতো না। আবার, কিছু প্রাণীতে দেহের বাইরে একটি শক্ত খোলস থাকে, যেমন, গলদা চিংড়ি। এই খোলসও প্রাণীর আকৃতি প্রদানে ভূমিকা রাখে।

আমাদের অভ্যন্তরীণ কঙ্কাল আমাদের সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেয় এবং অঙ্গগুলিকে সঠিক জায়গায় রাখতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন কোষের আকৃতি এবং তাদের অঙ্গণু ঠিক রাখতে তাদের সাইটোপ্লাজমের ভেতরে আণুবীক্ষণিক নলের মতো গঠন দেখা যায়, এদের মাইক্রোটিউবিউল বলে।

আমাদের যেমন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি কোষেরও নানা উপাদান গ্রহণ করতে হয়। আবার ঠিক আমাদের মতোই কোষের বর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থগুলিকে দূর করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের কোষ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। এসব কোষের আকার-আকৃতি তাদের কাজের ধরনের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ কোষে কোষগহ্বর নামক বড় ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে পানি, বর্জ্য ও খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এটি উদ্ভিদকে সোজা দণ্ডায়মান রাখতে সাহায্য করে। কোষগহ্বরে পানিশূন্যতা হলে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে।

বহুকোষী জীবে কোষগুলো কিন্তু একা একা কাজ করে না। বরং প্রায়ই এক গুচ্ছ কোষ একটি নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। এমন কোষগুচ্ছ যারা দেখতে একই রকম এবং একই কাজে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে টিস্যু বা কলা বলা হয়। কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন টিস্যুর নামকরণ করা



ছবি: প্রাণীকোষ

হয়। যেমন: প্রাণীদেহে পেশী, ত্বক, হাড়, রক্ত এবং স্নায়ু হলো বিভিন্ন ধরনের টিস্যু। এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত এবং এসব কোষ জীবদেহের কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে যুক্ত থাকে।

এককোষী জীব কাজের দিক দিয়ে অনেকটাই বড় বহুকোষী জীবের মতোন হয়। প্রতিটি কোষেই এমন সব গঠন থাকে যা একটি সম্পূর্ণ জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

৫.৩ জীবের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবী একটি প্রাণবন্ত গ্রহ। এখানে এমন সব জায়গায় জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যা কল্পনারও অতীত। সাগরের তলদেশের গরম আগ্নেয়গিরি মুখ থেকে শুরু করে অ্যাসিডপূর্ণ উষ্ণ ঝরনা থেকেও অতিক্ষুদ্র জীব পাওয়া যেতে পারে। কিছুকাল আগে বিজ্ঞানীরা অ্যান্টার্কটিকায় ২০ বছর ধরে শুষ্ক নদীর নিচে বেঁচে থাকা অণুজীবের সন্ধান পান। যখন সেখানে পানি পৌঁছায়, মাত্র একদিনের মাথায় সেগুলোতে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ একটি সম্প্রদায় তৈরি হয়ে যায়! তখন গবেষকদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি মঙ্গল গ্রহের শুষ্ক, শীতল পৃষ্ঠেও এমন জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে?

এই ছোট তথ্যগুলো থেকেই বোঝা যায়, জীববিজ্ঞান একটি আকর্ষণীয় এবং কখনও কখনও আশ্চর্যজনক বিষয়।

আমাদের চারপাশে যে জীবগুলো দেখি কিংবা যাদেরকে আমরা দেখতেই পাই না এদেরকে আমরা তিনটি ভাগে আলোচনা করতে পারি—উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব। এদের সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আরো বিশদভাবে জানব। তবে তার আগে আমরা জেনে নেবো জীবের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। জীব, হোক না উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীব, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়:

৫.৩.১ শক্তি স্রজন এবং ব্যবহার

প্রতিটি জীবেরই তাদের জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য শক্তি প্রয়োজন। উদ্ভিদ সূর্যালোক থেকে শক্তি শোষণ করে এবং সেটাকে খাদ্যে রূপান্তর করে। আবার, প্রাণীর শক্তি গ্রহণ করে উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব থেকে।



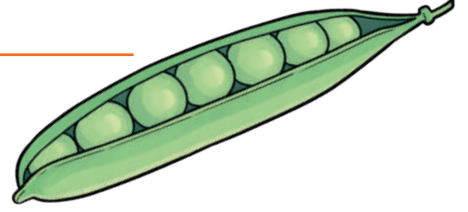
৫.৩.২ প্রজনন

জীব নিজের বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। অনেক বহুকোষী জীব, যেমন এই ইঁদুরটির জন্মের জন্য পিতা এবং মাতার প্রয়োজন। বাবা-মা দুজনের প্রত্যেকেই একটি করে বিশেষ কোষ প্রদান করে। বিশেষ কোষ দুটি একত্রিত হয়ে

একটি নতুন কোষ গঠন করে। পরবর্তী সময়ে এই কোষটিই পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে একটি নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়।

৩.৩.৩ বৃদ্ধি এবং বিকাশ

ছবির মটরশুঁটির মতো অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি বীজ পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হয়। প্রতিটি জীবের একটি সুনির্দিষ্ট জীবন চক্র রয়েছে যা তার আকার, আকৃতি, চলন ক্ষমতা এবং খাদ্যগ্রহণের ধরনে পরিবর্তন আনে।



৩.৩.৪ পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া

সরল জীবগুলোও পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। কখনো দেখেছ একটি কেঁচোকে স্পর্শ করা হলে সেটা কেমন তার দেহটাকে গুটিয়ে নেয়?

একই কথা লজ্জাবতী উদ্ভিদের পাতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার কিছু উদ্ভিদ, যেমন সূর্যমুখী, বেশি সূর্যালোক শোষণের জন্য সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে।



৩.৪ জীবের শ্রেণিবিন্যাস

এই পৃথিবীকে ঠিক কত সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীব রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানীরা সর্বশেষ যে অনুমান করছেন তাতে এই সংখ্যা প্রায় ৮.৭ মিলিয়ন বা ৮৭ লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যক ভিন্ন জীবকে আমরা কীভাবে চিনব এবং জানব? এই চিন্তা অনেককেই ভাবিত করেছিল। এর একটি সমাধান দিয়েছিলেন সুইডিশ উদ্ভিদবিদ কারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus), যিনি Carl Linnaeus নামেও পরিচিত (১৭০৭—১৭৭৮)। তিনি জীবের নাম ও শ্রেণিকরণের একটি পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। তিনি জীবকে বিভক্ত করেছিলেন তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। এই পদ্ধতিটি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে জীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিকরণ বা শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে 'প্রজাতি' (species), যেখানে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জীবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রজাতি বলতে বুঝায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক মিলসম্পন্ন জীবসমূহকে, যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম, যারা পরবর্তী সময়ে নিজেরাও তাদের

মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সন্তান জন্ম দিতে পারে।

একই ধরনের প্রজাতিগুলিকে একত্রিত করা হয় আরেকটি এককে—যাকে বলা হয় ‘গণ’ (genus)। যেমন, কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল একই গণ-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা আলাদা প্রজাতি।

এরই ধারাবাহিকতায় একই ধরনের ‘গণ’গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ‘গোত্র’ (family)-তে। গোত্র হচ্ছে গণ-এর উপরের ধাপ এবং গোত্রের ভেতরে গণের তুলনায় জীবের মাঝে কম সাদৃশ্য দেখা যায়।

একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী গোত্রগুলিকে ‘বর্গ’ (order) এর অন্তর্গত করা হয়। যেমন, কুকুর Carnivora বর্গের প্রাণী। কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল সমগোত্রীয় এবং এদেরকে যে বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিড়াল, বেজী ও ভাল্লুকও একই বর্গভুক্ত।

নিচে ছবিতে শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ দেখানো হলো

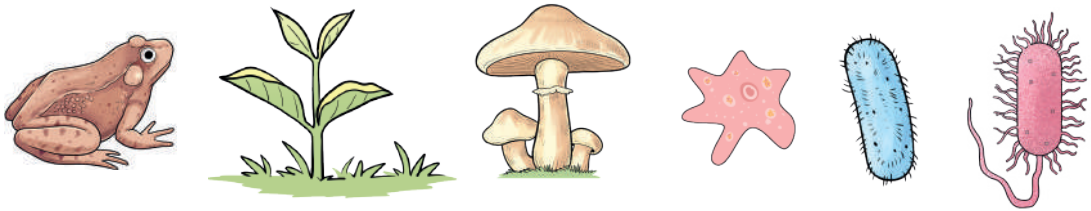


সমবর্গের জীবগুলোকে একত্রিত করা হয় আরেকটি এককে যার নাম 'শ্রেণি' (class)। Carnivora বর্গটি এমন একটি শ্রেণির অংশ যেখানে বাদুড়, শিম্পাঞ্জি এবং তিমির মতো প্রাণীরাও অন্তর্ভুক্ত।

অনেকগুলো শ্রেণি একটি 'পর্ব' (phylum) গঠন করে। এই ধাপে, কুকুর, পাখি, সাপ, ব্যাঙ এমনকি মাছও একই পর্বের মাঝে এসে যায়।

কয়েকটি পর্ব মিলে একটি জগত বা রাজ্য (kingdom) তৈরি হয়। রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃত এবং বৃহত্তম ধাপ। ছবিতে একটি বিড়ালকে অ্যানিমেলিয়া (Animalia) রাজ্য থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বিড়াল প্রজাতি পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। যদি আমরা মানুষের প্রজাতি বের করতে চাইতাম তাহলে মানুষ মাংসাশী প্রাণি নয় বলে সেটি ম্যামেলিয়া শ্রেণির পর অন্য একটি বর্গভুক্ত হয়ে যেতো। প্রজাপতির মেরুদণ্ড নেই, তাই আমরা যদি একটি প্রজাপতির প্রজাতি বের করতে চাইতাম তাহলে সেটি অ্যানিমেলিয়া (Animalia) রাজ্যের পরই মেরুদণ্ডী প্রাণির জন্য নির্দিষ্ট কর্তাটা পর্বভুক্ত না হয়ে অন্য একটি পর্বভুক্ত হতো।

যদি আমরা আম গাছের প্রজাতি বের করতে চাই, তাহলে কী করব? অ্যানিমেলিয়া (Animalia) নামটি থেকেই নিশ্চয় তোমরা অনুমান করতে পারছ, এই রাজ্যটি শুধুমাত্র প্রাণি (animal) জগতের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য তৈরি করা হয়েছে, এখানে কোন উদ্ভিদ নেই। উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য অন্য একটি রাজ্য থেকে শুরু করতে হবে, সেই রাজ্যের নাম প্লান্টি (Plantae)। ঠিক একই ভাবে আমরা যদি ব্যাঙের ছাতার প্রজাতি বের করতে চাই তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি রাজ্য থেকে শুরু করতে হবে, এই রাজ্যটির নাম ফানজাই (Fungi)।

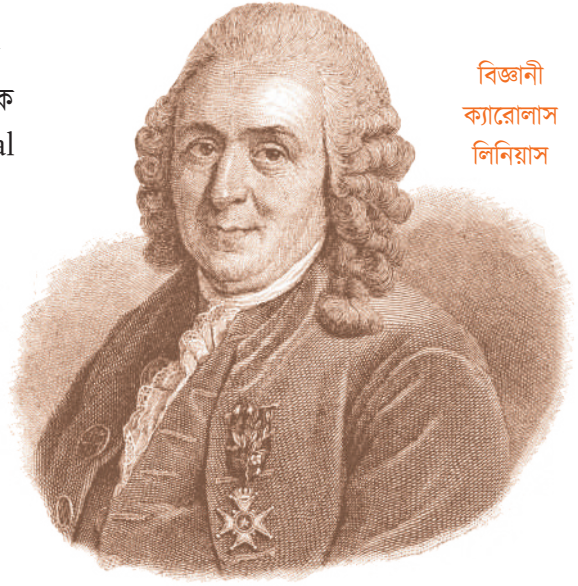


জীবজগতের ছয়টি রাজ্য: অ্যানিমেলিয়া, প্লান্টি, ফানজাই, প্রোটিস্টা, ইউব্যাকটেরিয়া ও আর্কিব্যাকটেরিয়া

ঠিক কয়টি রাজ্য দিয়ে শুরু করলে জীব জগতের সকল জীবকে কোন না কোনোভাবে শ্রেণি ভুক্ত করা যাবে সেটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভেতর একটু বিতর্ক এবং মতভেদ রয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জীবজগতকে সর্বমোট ছয়টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। একটু আগেই তোমরা অ্যানিমেলিয়া, প্লান্টি ও ফানজাই এই তিনটি রাজ্যের কথা জেনেছ। অন্য তিনটি রাজ্য হচ্ছে প্রোটিস্টা (Protista), ইউব্যাকটেরিয়া (Eubacteria) এবং আর্কিব্যাকটেরিয়া (Archaeobacteria)। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৫.৫ প্রজাতির নামকরণ

বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস গণ এবং প্রজাতির নাম ব্যবহার করে পরিচিত জীবগুলোর বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন, যা দ্বিপদ নামকরণ (Binomial nomenclature) নামেও পরিচিত। অধিকাংশ জীবের বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যেমন Carnivora শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দের অংশ। Carn অর্থ ‘মাংস’ Vorus অর্থ ‘গ্রাসকারী’। সকল গৃহপালিত বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম *Felis catus*।



বিজ্ঞানী
ক্যারোলাস
লিনিয়াস

সন্ধাননী ?

- ১। কোষের গঠনে কোন কোন অংশগুলো আবশ্যিক বলতে পারো?
- ২। ধরো, তুমি নিজেই কোনো একটা নতুন প্রজাতির মাছ, ব্যাঙ কিংবা পোকা আবিষ্কার করে ফেললে! কী নাম রাখবে এই নতুন প্রাণীর? কেনো?



ଅଧ୍ୟାୟ ୬
ଈହିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଗୁଜୀବ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ সাধারণ পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং মিল-অমিলের ভিত্তিতে জীবজগতের বিভিন্ন ভাগ; যেমন: অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী
- ☑ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সাধারণ তুলনামূলক আলোচনা

৬.১ উদ্ভিদ



জীব জগতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উদ্ভিদ। শুধু খাবারের উৎস হিসেবেই নয়, বরং পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উদ্ভিদ অপরিহার্য। উদ্ভিদ অনেক রকমের হয়, কিন্তু সকল উদ্ভিদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের এ পৃথিবী সব জায়গা একই রকম নয়। এর কোথাও আছে সমভূমি, কোথাও আছে মরুভূমি, কোথাও আবার গিরিমালা। এখানে রয়েছে নদীনালা, খালবিল, হাওড়-বাঁওড় ইত্যাদি। আমাদের এই চিরচেনা বিশাল পৃথিবীকে বৈচিত্র্যময় করে

তুলেছে নানা আকার, আকৃতি ও বর্ণের গাছ পালা। সমুদ্রের গভীরে যেমন রয়েছে উদ্ভিদ, তেমনি সুউচ্চ গিরিমালাতেও পাওয়া যায় এর অবস্থান। আবহমানকাল থেকে পৃথিবীতে জীবনের যে বিচিত্র প্রবাহ চলে আসছে, তার মূলে রয়েছে সবুজ উদ্ভিদের বিরাট অবদান।

৬.১.১ উদ্ভিদজগতের বৈচিত্র্য

উদ্ভিদগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একে অপর থেকে ভিন্ন। এ কারণে উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্যও অনেক বেশি। এ সকল উদ্ভিদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদাভাবে জানা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই বিশাল উদ্ভিদ জগতকে সহজ উপায়ে জানার জন্য এদেরকে নানান দলে বা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

বর্ষজীবী উদ্ভিদ

ধান, মটর, ছোলা, কলা এসব আমাদের অতি পরিচিত উদ্ভিদ। এরা এক বছর অবধি বেঁচে থাকে। এজন্য এদেরকে একবর্ষী উদ্ভিদ বলা হয়। আবার যে সকল উদ্ভিদের জীবনকাল দুই বছর, যেমন: মূলা, গাজর, ফুলকপি এরা দ্বিবর্ষী উদ্ভিদ নামে পরিচিত। অন্যদিকে আমাদের চারপাশে কিছু কিছু উদ্ভিদ দেখতে পাই যারা বহু বছর বেঁচে থাকে, যেমন: আম, কাঁঠাল, তাল ইত্যাদি। এদেরকে বহুবর্ষী উদ্ভিদ বলে। উদ্ভিদের এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে কোন উদ্ভিদ কত বছর বাঁচে তার ভিত্তিতে।

বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ

বিভিন্ন জীবনকালের উদ্ভিদের পাশাপাশি এদের আকার আকৃতির মধ্যেও অনেক ভিন্নতা দেখতে পাবে। যেমন কিছু উদ্ভিদ দেখবে যারা লতানো হয়, আবার কিছু আছে নরম গঠনের হয় কিন্তু লতানো নয়। এর পাশাপাশি শক্ত কাণ্ডবিশিষ্ট ও লম্বায় অনেক উদ্ভিদ ও দেখতে পাবে। এরকম ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ জগতকে বীরুৎ (ছোট, নরম উদ্ভিদ যেমন: ধান, সরিষা, মরিচ), গুল্ম (ছোট গাছ যেমন ডালিম, হাসনাহেনা, কামিনী) এবং বৃক্ষ (কাঠল বড় গাছ, শাল, সেগুন, তাল) এ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ সাধারণত কাঠলজাতীয়, সুউচ্চ কাণ্ডবিশিষ্ট হয়ে থাকে। অপরদিকে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদে সাধারণত নমনীয় বহুকাণ্ড দেখা যায় এবং বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ নরম কাণ্ডবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ

আমাদের উদ্ভিদরাজি অসংখ্য বৈচিত্র্যের আধার। অনেক উদ্ভিদ আছে যারা ফুল বহন করে আবার অনেক উদ্ভিদ ফুল ছাড়াই জীবনকাল অতিবাহিত করে। ফুলের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দুই দলে ভাগ করা হয়েছে। যে সকল উদ্ভিদে ফুল হয়, যেমন: আম, জাম, ধান, নারিকেল এরা সপুষ্পক উদ্ভিদ। অপরদিকে মস, ফার্ন ইত্যাদি যাদের ফুল হয় না, এরা অপুষ্পক উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত। ফুলের উপস্থিতি উদ্ভিদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ফুলের জন্যই পরাগায়ন সহজতর হয়, যা উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।



অপুষ্পক উদ্ভিদ ফার্ন



পরভোজী উদ্ভিদ ইন্ডিয়ান পাইপ

স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ

দেহের পুষ্টি সাধনের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে স্বভোজী ও পরভোজী এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। আমাদের চেনা সব সবুজ উদ্ভিদের কোষে ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে। এরাই হলো স্বভোজী উদ্ভিদ। অন্যদিকে স্বর্ণলতা, ঘোস্ট প্ল্যান্ট বা ইন্ডিয়ান পাইপ ইত্যাদি উদ্ভিদে ক্লোরোফিল না থাকায় এরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না এবং অন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, তাই এরা পরভোজী উদ্ভিদ।

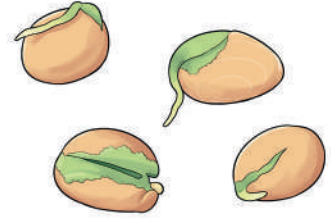
৬.১.২ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি

সকল জীবেরই প্রজনন ঘটে। প্রজনন হলো বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমেই একই প্রজাতির নতুন নতুন বংশধর সৃষ্টি হয়। প্রজনন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যৌন প্রজননে ভিন্ন ভিন্ন পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনের নতুন সদস্য তৈরি হয়। আবার, অযৌন প্রজননে শুধু এক ধরনের কোষ থেকে নতুন বংশধর তৈরি হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীবে উভয় ধরনের প্রজনন দেখা যায়।

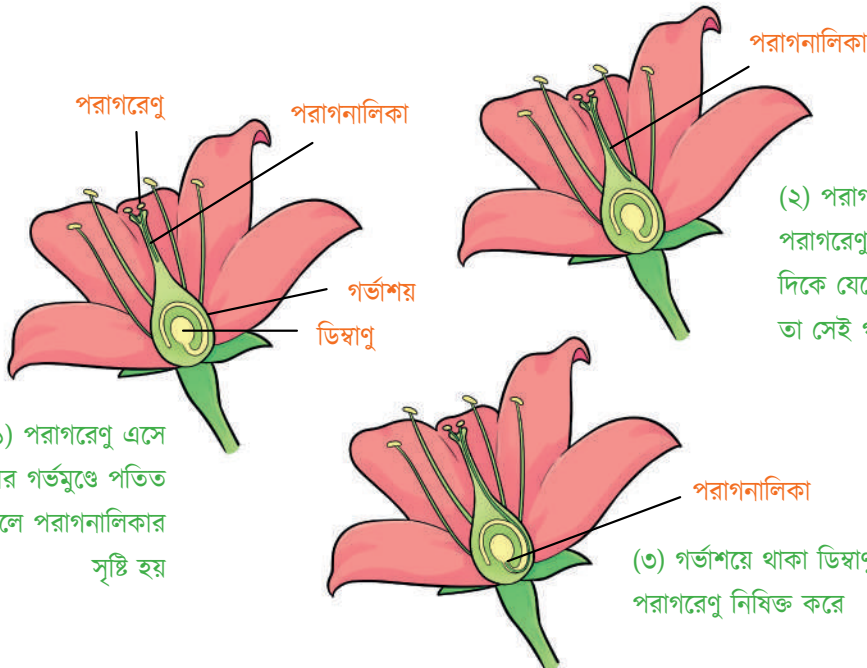
বীজযুক্ত উদ্ভিদ

বীজ হলো উদ্ভিদের জীবনচক্রে তৈরি এমন একটি গঠন যা নতুন চারা গাছের জন্ম দিতে পারে। বীজে খাদ্য জমা থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে নতুন গাছ বেড়ে ওঠে।

কখনো কী ভেবে দেখেছ বীজ কীভাবে তৈরি হয়? বীজযুক্ত গাছের যৌন প্রজনন ঘটে থাকে, এখানে গাছের পুংজনন কোষ বা পরাগরেণুর (pollen) স্ত্রী জনন কোষের ডিম্বাণুর (egg cell) সাথে মিলন ঘটে। ফুলের পুংকেশরের পরাগধানীতে পরাগরেণু আর গর্ভদণ্ডের নিচে গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয়। পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বাতাস, মৌমাছি কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে ফুলের মাধ্যমে গর্ভমুণ্ডে যায়, এই প্রক্রিয়াকে



ছবি: কাঁঠালের বিচি



ছবি: নিষেক

পরাগায়ন (pollination) বলে। যখন একই ফুলের কিংবা একই গাছের ভিন্ন ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে। আবার ভিন্ন গাছের ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটলে তাকে পর-পরাগায়ন বলে।

পরাগরেণু এসে পরাগমুণ্ডে পতিত হলে পরাগনালিকার সৃষ্টি হয়। এই নালিকা বেয়ে পরাগরেণু নিচে গর্ভাশয়ের দিকে যেতে থাকে। একসময় সেটি গর্ভাশয়ে থাকা ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। এই মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেক (fertilization) বলে, এবং নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ফল এবং বীজ তৈরি হয়।

বীজহীন ফলের উদ্ভিদ

কিছু কিছু উদ্ভিদের ফলে বীজ তৈরি হয় না। এসব ক্ষেত্রে স্পোরের (spore) মাধ্যমে গাছের বংশবৃদ্ধি ঘটে, এই ধরনের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে উদ্ভিদের অযৌন বংশবৃদ্ধির উদাহরণ। স্পোর হলো এক বিশেষ ধরনের ছোট কোষ। উদ্ভিদের যেই অংশে স্পোর সৃষ্টি হয় তাকে স্পোর ক্যাপসুল (spore capsule) বলে।

বীজের ভিন্নতা

বীজের আবরণ থাকা এবং না থাকার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে আবৃতবীজী (angiosperm) ও অনাবৃতবীজী (gymnosperm)- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিস্তার ফুলের উপর নির্ভরশীল হলেও অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেটি নয়। অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের বীজ সাধারণত একটা শক্ত আবরণের ভেতরে থাকে যাকে কোন (cone) বলা হয়, উদাহরণ হিসেবে পাইন গাছের কোনের কথা বলা যেতে পারে। অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ হলো প্রাচীনতম উদ্ভিদ। যখন পৃথিবীতে ডাইনোসর ছিল, তখন স্থলজ উদ্ভিদের মধ্যে অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ ছিল প্রধান। প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এই উদ্ভিদগুলোর আবির্ভাব হয়েছে। সেই তুলনায় আবৃতবীজী উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে প্রায় ১০০ মিলিয়ন বছর আগে।

৬.২. প্রাণী



তোমার কি কোনো পোষা প্রাণী আছে? যদি নাও থেকে থাকে, তারপরেও নিশ্চয়ই কত রকম প্রাণী দেখেছ, একটু ভেবে বলো দেখি, কোন প্রাণীটি তোমার প্রিয়, কেন প্রিয়? ভূমি যেসব প্রাণী দেখেছ তাদের ভেতর পার্থক্যগুলো কি চোখে পড়ে?

৬.২.১ মেরুদণ্ডী প্রাণী

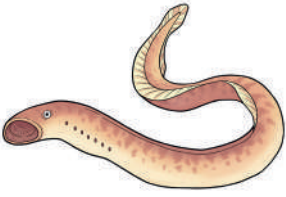
পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তাদের ভেতর রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। যেমন—তোমার পোষা বিড়ালটির একটা শক্ত শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড রয়েছে। তোমারও পিঠের মাঝ বরাবর একটি মেরুদণ্ড রয়েছে, যা তোমাকে

সোজা হয়ে চলতে সহযোগিতা করে। আবার অনেক প্রাণী আছে যাদের মেরুদণ্ড নেই—যেমন কেঁচো। নিশ্চয়ই দেখে থাকবে কেঁচো কীভাবে বুকে ভর দিয়ে চলে। কাজেই সব প্রাণীকে প্রথমেই আমরা মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হচ্ছে সেসব প্রাণী যাদের শরীরে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত একটি মেরুদণ্ড থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। জলে-স্থলে থাকা এমনকি সমুদ্রের বৃহত্তম প্রাণীরাও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ

মেরুদণ্ডী প্রাণী হলো মেরুরজ্জু (nerve cord) যুক্ত প্রাণী। এটি তাদের পিঠ বরাবর নিচের দিকে নেমে আসে। এসব প্রাণী মূলত কর্ডাটা নামে পরিচিত। মেরুদণ্ড এই মেরুরজ্জুকে রক্ষা করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সুরক্ষা এবং চলাচলের জন্য শরীরের ভেতর অন্তঃকঙ্কাল (endoskeleton) থাকে। এই অন্তঃকঙ্কাল হাড় (bones) ও তরুণাস্থি (cartilage) দিয়ে তৈরি। তরুণাস্থি হলো নরম, হাড়ের মতো উপাদান যা প্রাণীর সাথে বৃদ্ধি পায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে সরীসৃপ, উভচর, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিভিন্ন ধরনের মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিগুলোকে পরিপূর্ণ করে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাতটি শ্রেণি

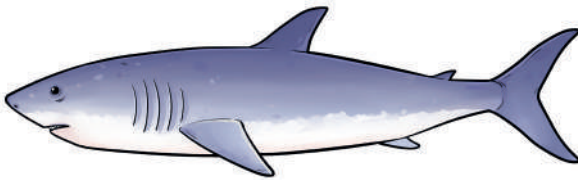
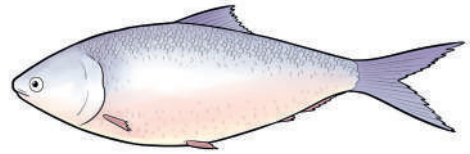


১) চোয়ালবিহীন মাছ

প্রায় ৭০টি মাছের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাদের চোয়াল নেই। এদের মাঝে হ্যাগফিশ ও ল্যাম্প্রে অন্যতম। ফুলকায়ুক্ত এসব মাছের কঙ্কাল অত্যন্ত নমনীয় হয়।

২) অস্থিযুক্ত মাছ

প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির মাছ আছে যাদের সুগঠিত কঙ্কাল থাকে, যার গঠন অস্থির মতো। শক্ত অস্থিবিশিষ্ট কঙ্কালের এসব মাছ শ্বসনের জন্য ফুলকা ব্যবহার করে। এই শ্রেণির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো রুই, ইলিশ ইত্যাদি।



৩) তরুণাস্থিযুক্ত মাছ

কোমল তরুণাস্থি নিয়ে সিংহ, করাত মাছ ও নানা জাতের হাঙরের কঙ্কাল গঠিত হয়। এদেরও শ্বসনের জন্য সুগঠিত ফুলকা থাকে। তরুণাস্থিযুক্ত মাছের প্রায় ৭৫০টি প্রজাতি রয়েছে।

৪) উভচর প্রাণী

জল ও স্থল উভয় পরিবেশে বসবাস করার জন্য উভচর প্রাণীদের বিশেষ দেহ গঠন থাকে। তরুণ বয়সে এরা পানিতে থাকার সময় ফুলকা দিয়ে শ্বসন কাজ চালালেও পরিণত বয়সে স্থলে বাস করার সময় ফুসফুস দিয়ে চালায়। এসব প্রাণীর শক্ত চোয়াল, মসৃণ ত্বক ও অস্থিযুক্ত কঙ্কাল থাকে। প্রায় ৪৭০০ প্রজাতির উভচর প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, স্যালামেন্ডার বহুল পরিচিত।



৫) সরীসৃপ

সরীসৃপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা বুকে ভর দিয়ে চলাফেরা করে। টিকটিকি, গিরগিটি, কুমির, কচ্ছপ, সাপসহ প্রায় ৮০০০ প্রজাতির সরীসৃপ পাওয়া যায়। কিছু সরীসৃপ জলে বাস করে। আবার কিছু স্থলে বাস করে। এদের সুগঠিত ফুসফুস থাকে। আঁশযুক্ত ত্বকের আবরণে শক্ত অস্থিযুক্ত কঙ্কাল থাকে।



৬) পাখি

প্রায় ৯৭০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া গিয়েছে। পালকযুক্ত ডানার সাহায্যে অধিকাংশ পাখিই উড়তে পারে, ব্যতিক্রম উটপাখি। ফাঁপা অস্থিযুক্ত কঙ্কালের জন্য পাখিরা বেশ হালকা হয়। পাখিদের ফুসফুস থাকে। আমাদের অতিপরিচিত পাখিদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো কাক, চড়ুই, কবুতর, দোয়েল, ঈগল প্রভৃতি।



৭) স্তন্যপায়ী

মানুষ, কুকুর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, জলহস্তীসহ বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী স্থলে বাস করে। কিন্তু তিমি স্তন্যপায়ী হয়েও সমুদ্রে থাকে। স্তন্যপায়ীরা শিশুকালে মায়ের দুধ পান করে। এরা সবচেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো চার পা (tetrapod) বিশিষ্ট, যেমন: গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি, কিছু দুই পা (bipod) বিশিষ্ট, যেমন—মানুষ। স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ লোমশ হয়। অস্থিযুক্ত কঙ্কাল এদের দেহ গঠন করে। সুগঠিত চোয়ালের জন্য এরা নানা ধরনের খাবার খেতে পারে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৭০০টি স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে।



৬.২.২ অমেরুদণ্ডী প্রাণী

সহজ ভাবে বলা যায়—যে প্রাণীদের মেরুদণ্ড থাকে না তারাই অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সকল পরিবেশে পাওয়া গেলেও এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, সমস্ত প্রাণীর ৯৫ শতাংশেরও বেশি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা নানা পরিবেশে বাস করে। মরুভূমিতে, সমুদ্রের তলদেশে এবং এমনকি অন্যান্য জীবের ভিতরেও এদের পাওয়া যায়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নানা শ্রেণিতে ভাগ করা

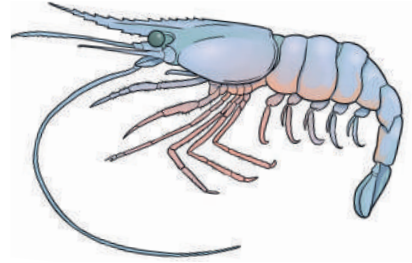
যায়, এদের মাঝে আর্থ্রোপড (Arthropod) হলো অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃহত্তম দল, যাদের ১২ লক্ষেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়ি, প্রভৃতি।

আর্থ্রোপড

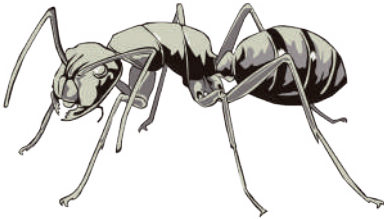
আর্থ্রোপডের বহিঃকঙ্কাল (exoskeleton) শক্ত প্রকৃতির এবং সেটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে রক্ষায় কাজ করে। বহিঃকঙ্কাল প্রাণীর বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায় না কাজেই প্রাণীর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এটিকে অবশ্যই দেহ থেকে মুক্ত করে দিতে হয়। আর্থ্রোপডদেরও সন্ধিযুক্ত পা থাকে যা তাদের চলাফেরা করতে সাহায্য করে। তাদের দেহ কয়েকটি বিশেষ খণ্ডে বিভক্ত থাকে। আর্থ্রোপডের তিনটি বৃহত্তম দল হলো ক্রাস্টাসিয়ান (Crustaceans), কীটপতঙ্গ (Insects) এবং অ্যারাকনিড (Arachnids)।

ফ্রস্টাসিয়ান

কাঁকড়া, চিংড়ি এবং লবস্টার ক্রাস্টাসিয়ানের উদাহরণ। ক্রাস্টাসিয়ানদের ৩০,০০০ টিরও বেশি পরিচিত প্রজাতি রয়েছে। সমুদ্রে এদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া গেলেও ক্রাস্টাসিয়ানরা মিঠা জল, নোনা জল এমনকি মাটিতেও বাস করে।

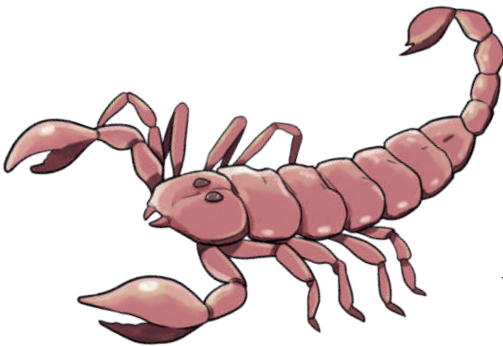


কীটপতঙ্গ বা ইনসেক্ট

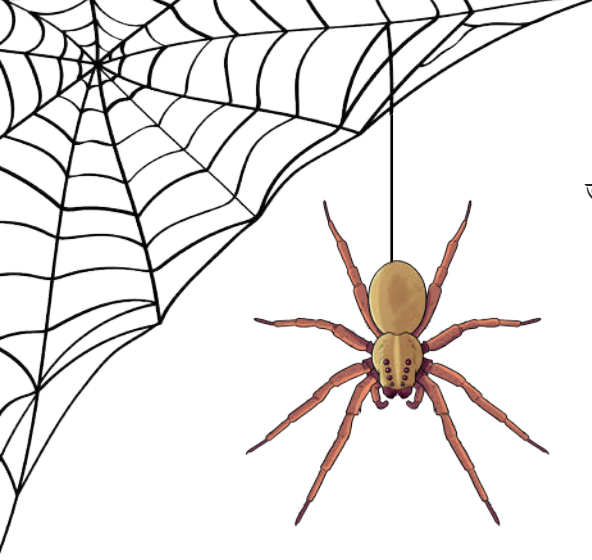


আর্থ্রোপডের বৃহত্তম দল হলো কীটপতঙ্গ; পিঁপড়া, তেলাপোকা কিংবা মশা মাছি হচ্ছে এদের উদাহরণ। আর্থ্রোপডের মধ্যে ১০ লক্ষেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে, তার মধ্যে বড় অংশই কীটপতঙ্গ। কীটপতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীরা মস্তিষ্ক, বক্ষ এবং উদর এই ৩টি খণ্ডে বিভক্ত থাকে। তিন জোড়া পা এদের বক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। অ্যান্টেনা এবং চোখ কীটপতঙ্গকে তার আশপাশের পরিবেশ বুঝতে সাহায্য করে।

অ্যারাকনিড



মাকড়সা কিংবা বিছা হচ্ছে অ্যারাকনিডের উদাহরণ। এদের চার জোড়া পা এবং একটি বা দুটি দেহ খণ্ড আছে। এদের কোনো অ্যান্টেনা নেই। মাকড়সা এক ধরনের শিকারি প্রাণী যারা প্রধানত কীটপতঙ্গ খাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সকল মাকড়সা শক্তিশালী রেশম ফাইবার উৎপাদন করে। কিছু মাকড়সা এই রেশমের জাল বুনে শিকার ধরে থাকে।



আর্থোপড ছাড়া আরও নানা ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী আছে। যেমন আমাদের পরিচিত প্রাণীদের মাঝে কেঁচো কিংবা জেঁক আছে এনালিডা (Annelids) শ্রেণির, জেলিফিশ এবং প্রবাল হচ্ছে নিডারিয়া (Cnidaria) শ্রেণির। ঝিনুক, শামুক কিংবা অক্টোপাস হচ্ছে মলাস্কা (Mollusk) শ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পরবর্তী শ্রেণিতে তোমরা এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

৬.৩ অণুজীব

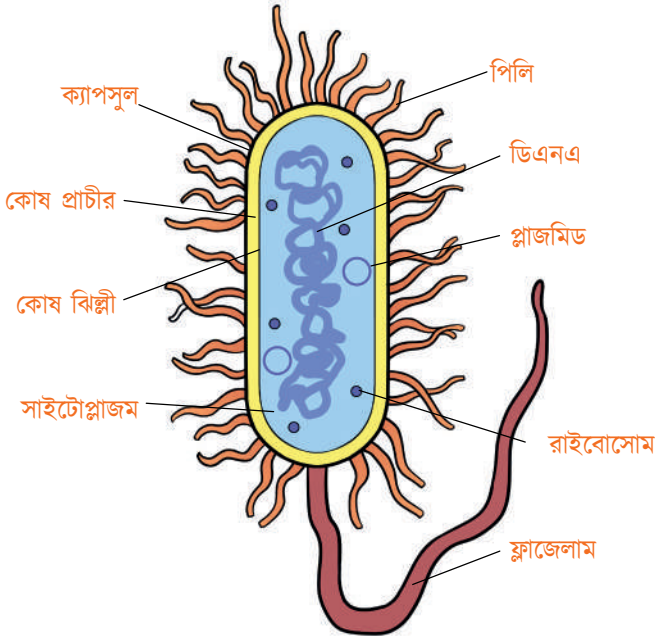


খালি চোখে দেখা যায়না এমন জীবন্ত বস্তু হলো অণুজীব। অণুজীবগুলো এককোষী হতে পারে অর্থাৎ যাদের শুধু একটি কোষ আছে। কিছু অণুজীব বহুকোষী, যার একাধিক কোষ থাকে। অণুজীবদের জন্য খাদ্য, বায়ু, পানি, বর্জ্য নিষ্পত্তির উপায় এবং তারা বসবাস করতে পারে এমন পরিবেশ প্রয়োজন। কিছু অণুজীব উৎপাদক (producer) অর্থাৎ সূর্যালোক ব্যবহার করে সরল পদার্থ থেকে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে (উদ্ভিদের মতো)।

কিছু অণুজীব পরজীবী বা ভোক্তা (consumer), যারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না এবং খাদ্যের জন্য অন্যান্য জীবের উপর নির্ভরশীল। বেশিরভাগ অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে না বরং অনেক অণুজীব জীবনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অণুজীব বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মতোই অণুজীবদের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এই শ্রেণিবিন্যাসগুলো অণুজীবের আকার, গঠন, খাদ্যের উৎস, বাসস্থান, এবং চলাচল দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই অণুজীবের মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং প্রোটিস্ট। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ছত্রাক এবং প্রোটিস্ট যেরকম এককোষী হতে পারে ঠিক যেরকম বহুকোষী এমনকি আকারে যথেষ্ট বড় হতে পারে। অর্থাৎ, ছত্রাক বা প্রোটিস্ট মাত্রই যে সাধারণ অণুজীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খালি চোখে দেখা যায় না এমনটা নয়। এদের সম্পর্কে একটু পরেই আমরা আরেকটু বিশদভাবে জানব। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং প্রোটিস্ট ছাড়াও ভাইরাস নামে এক ধরনের অণুজীব রয়েছে যেগুলোর আসলে স্বাধীন জীবন নেই।

৬.৩.১ ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং সুপ্রচুর জীবগোষ্ঠী। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে জানত না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে অ্যান্টোনি ভন লিউয়েনহুক, একজন ডাচ বণিক তাঁর দাঁতের স্ক্র্যাপিং পর্যবেক্ষণ করতে একটি সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ) ব্যবহার করেছিলেন। লিউয়েন হুক জানতেন না যে, তিনি যে ক্ষুদ্র জীবগুলি দেখেছিলেন তা আসলে ব্যাকটেরিয়া। ২০০ বছর পর প্রমাণিত হয়েছিল যে ব্যাকটেরিয়ারও জীবন রয়েছে। ব্যাকটেরিয়া প্রায় সকল পরিবেশে



ছবি: ব্যাকটেরিয়া

বাস করে। এদের সমুদ্র, মাটি, পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে গভীর শিলায়, প্রাণীদেহে এমনকি মানুষের অন্ত্রেও পাওয়া যায়। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি এমনকি উষ্ণ প্রস্রবণ, সমুদ্রের তলদেশ, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ কিংবা অতি লবণাক্ত পরিবেশ—এই ধরনের প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। জীবাণুমুক্ত করা হয়নি এমন যে কোনো পৃষ্ঠ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আবৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীতে মোট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অবিশ্বাস্য, অনুমান করা হয় এই সংখ্যা পাঁচ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন (পাঁচের পর ত্রিশটি শূন্য)! তুমি কি জান তোমার দেহের কোষের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাকটেরিয়া তোমার দেহে বসবাস করে?

ব্যাকটেরিয়া একটি নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তারপর দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রজনন করে। তখন একটি মাতৃকোষ বিভক্ত হয়ে দুটি অভিন্ন অপত্যকোষ তৈরি হয়। এর ফলে খুব দ্রুত ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আদর্শ পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি একটি অস্থিতিশীল পরিবেশেও ব্যাকটেরিয়াকে টিকে থাকতে সহায়তা করে।

ব্যাকটেরিয়া অনেক ধরনের হয়, কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য ও অক্সিজেন তৈরি করতে পারে; কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া আবার পরভোজী, খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। আকৃতির দিক দিয়ে দেখলেও ব্যাকটেরিয়া নানা ধরনের হয়, যেমন: রড, গোলাকার বা সর্পিল আকৃতির।

৬.৩.২ ছত্রাক

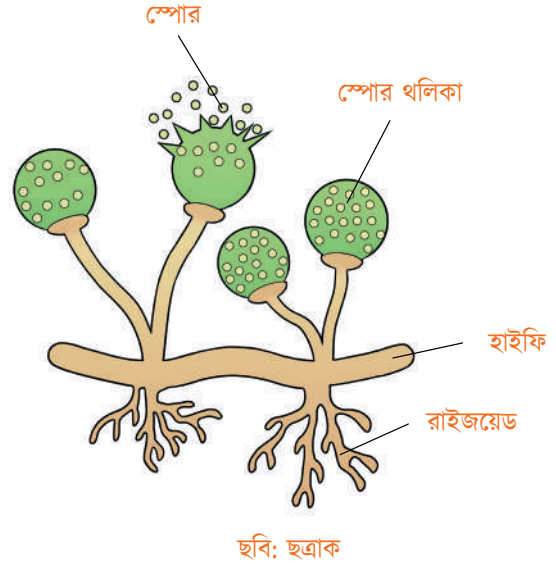
ছত্রাক বলতেই আমাদের সবচেয়ে পরিচিত যে উদাহরণ মনে পড়ে তা হচ্ছে ব্যাঙের ছাতা। এর বাইরেও রুগি বাসি হওয়ার পরে এর উপরে যে নীলাভ সবুজ ছত্রাক জন্মায় সেটাও আমাদের সবারই চেনা। তবে ছত্রাকের এসব প্রজাতি খালি চোখে দেখতে পেলেও অধিকাংশ ছত্রাকই এত ক্ষুদ্র যে তাদের মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না। সেজন্য ছত্রাক সাধারণত অণুজীব হিসেবে বিবেচিত হয়।

ছত্রাক ফানজাই (Fungi) রাজ্যের অন্তর্গত জীব (একবচন: ফাঙ্গাস)। তাদের ক্লোরোফিল নেই তাই সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না এবং শোষণের (absorption)

মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে। বেশিরভাগ ছত্রাক বহুকোষী, তবে কিছু এককোষী হিসেবে বিদ্যমান।

ছত্রাকের প্রায় ১৫ লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। ছত্রাক নানা পরিবেশে বাস করে—যেমন, মাটির গভীরে, ক্ষয়প্রাপ্ত গাছের গুঁড়ির নিচে বা গাছপালা এমনকি প্রাণীর ভিতরে যেখানে এদের সহজে দেখা যায় না। কিছু ছত্রাক আবার অন্য ছত্রাকের ভেতরে বা তার উপরেও বসবাস করতে পারে।

ছত্রাক আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেক প্রজাতি মানুষের জন্য উপকারী। আমাদের পরিবেশের জন্য ছত্রাক খুব প্রয়োজন। ছত্রাক বিভিন্ন পদার্থকে পচিয়ে তা থেকে পুষ্টি উৎপাদন এবং অন্যান্য জীবের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করতে সাহায্য করে।



৬.৩.৩ প্রোটিস্ট

প্রোটিস্টরা সুকেন্দ্রিক বা ইউক্যারিয়টিক কোষের একটি অতি বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় শ্রেণি—তোমরা জানো, যে কোষের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে তাদের সুকেন্দ্রিক কোষ বলে। প্রোটিস্টরা গঠনগতভাবে একে অপরের থেকে খুব আলাদা, কোনোটি অ্যামিবার মতো ক্ষুদ্র ও এককোষী, আবার কোনোটি সামুদ্রিক শৈবালের মতো বড় এবং বহুকোষী। যেসব সুকেন্দ্রিক জীব এই প্রোটিস্টা রাজ্যটি তৈরি করে, অন্যান্য রাজ্যের প্রাণীদের সাথে তাদের খুব বেশি মিল নেই। কোনো কোনো প্রোটিস্ট প্রাণীর মতো খাবার খোঁজে, কোনো কোনোটি উদ্ভিদের মতো সালোকসংশ্লেষণ করে আবার কোনো কোনোটি ছত্রাকের মত পরভোজী। এত মিল থাকার পরেও প্রোটিস্টকে সরাসরি প্রাণী, উদ্ভিদ কিংবা ছত্রাক কোনো শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

প্রাণীসদৃশ প্রোটিস্ট:

কিছু কিছু প্রাণীসদৃশ প্রোটিস্ট তাদের কোষের পৃষ্ঠদেশ প্রসারিত করে পায়ের মত কাঠামো তৈরি করে প্রাণীর মত চলাফেরা করে, এদেরকে সুডোপডস (Pseudopods) বলে। সিলিয়েট (Ciliate) নামে প্রোটিস্ট কোষপৃষ্ঠের সিলিয়া নামের ছোট ছোট চুলের মত অংশকে নাড়িয়ে স্থান পরিবর্তন করে। আবার ফ্ল্যাগেলেট (Flagellate) নামে কিছু কিছু প্রাণী-সদৃশ প্রোটিস্ট পশ্চাৎদেশের অপেক্ষাকৃত লম্বা চুলের মত একটি ফ্লাজিলাকে পাখার মত ঘুরিয়ে চলাচল করে।



উদ্ভিদসদৃশ প্রোটিস্ট:

এরা শৈবাল নামে পরিচিত, আকারে বড় এবং বৈচিত্র্যময় একটি শ্রেণি। এরা এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে। উদ্ভিদের মতো এদের কাণ্ড, মূল বা পাতা নেই, কিন্তু এরা উদ্ভিদের মতো সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি করতে পারে একই সাথে প্রাণীদের শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে। বেশিরভাগ উদ্ভিদসদৃশ প্রোটিস্টরা সমুদ্র, পুকুর বা হ্রদে বাস করে।

সামুদ্রিক শৈবাল এবং কেব্ল (kelp) বহুকোষী, উদ্ভিদসদৃশ প্রোটিস্টের উদাহরণ। কেব্ল আকারে উদ্ভিদের মতো বড় হয়ে সমুদ্রে একটি 'অরণ্য' তৈরি করে ফেলতে পারে। এ ধরনের প্রোটিস্ট বাস্তুতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য এবং সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলের ভিত্তি।

ছত্রাকসদৃশ প্রোটিস্ট:

ছত্রাকসদৃশ প্রোটিস্টগুলোর সাথে ছত্রাকের অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। তারা উভয়েই পরভোজী, খাদ্যের জন্য তারা অন্য জীবের উপর নির্ভরশীল। ছত্রাকের মতো এদের কোষেও কোষ প্রাচীরের উপস্থিতি থাকে এবং এরাও স্পোর ব্যবহার করে প্রজননে অংশ নেয়। ছত্রাকসদৃশ প্রোটিস্টের দুটি উদাহরণ হলো, স্লাইম মোল্ড এবং জলীয় মোল্ড।

৬.৩.৪ ভাইরাস

আমরা সবাই এখন SARs-CoV-2 ভাইরাস সম্পর্কে জানি, যেটি COVID-19 এর কারণ। ভাইরাস মূলত প্রোটিন আবরণে মোড়ানো, ডিএনএ (DNA) কিংবা আরএনএ (RNA) নামে জেনেটিক বস্তু। এসব অতিক্ষুদ্র জীবের কেউ কেউ আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টির কারণ। আমাদের অতি

শৈবাল কেন উদ্ভিদ নয়?



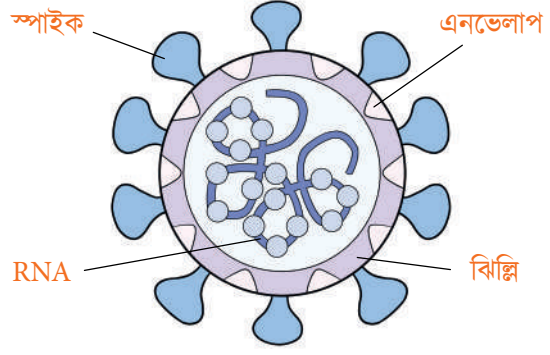
ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি এবং সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকার জন্য সাধারণভাবে অনেকসময় আমরা শৈবালকে উদ্ভিদ ভেবে থাকি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায়, শৈবালে প্রকৃত উদ্ভিদ কোষের অনেক কিছুই থাকে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শৈবালের মূল, কাণ্ড বা পাতা নেই। কিছু শৈবাল দেখা যায়, যারা আবার চলাফেরা করতে সক্ষম। এরা সুডোপড (pseudopod) বা ফ্ল্যাগেলার (flagella) সাহায্যে চলাফেরা করতে পারে, যা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নয়। যদিও শৈবাল নিজেরা উদ্ভিদ না; এরা সম্ভবত উদ্ভিদের পূর্বপুরুষ ছিল।

পরিচিত রোগ সর্দি-কাশির পেছনেও ভাইরাস দায়ী। যেহেতু ভাইরাসের কোনো কোষ নেই তাই অন্য কোষের মতো এদের কোনো কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম কিংবা রাইবোসোম নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, ভাইরাস কি জীবিত? আমরা জানি সমস্ত জীবের কোষ থাকে; সেই সাথে তারা প্রজননেও সক্ষম। কিন্তু ভাইরাস নিজেরা প্রজনন করতে পারে না। ভাইরাস এমন একটি সত্তা যা অন্য একটি জীবের কোষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোষগুলিকে পোষক (host) কোষ বলা হয়।

জীবকোষে একবার ভাইরাস ঢুকে গেলে, সেটি কোষে তার সংখ্যাবৃদ্ধির নির্দেশ দেয়। ভাইরাসের জেনেটিক বস্তুর নির্দেশে জীবকোষ অসংখ্য ভাইরাসের প্রতিলিপি তৈরি করে। তারপর কোষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ফেটে যায় এবং ভাইরাসগুলি মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন ভাইরাস তখন একটি নতুন পোষক কোষ দখল করতে পারে। এভাবে পোষক কোষ একদিনেই ১০ বিলিয়ন পর্যন্ত অনুরূপ ভাইরাস তৈরি করতে পারে। ভেবে দেখো, ভাইরাস যদি একটি মুদ্রার সমান হতো তাহলে একদিনে তৈরি ১০ বিলিয়ন ভাইরাস পুরো একটা ফুটবল মাঠকে ১ মিটারের বেশি (৩ ফুট) গভীরতায় ভরে ফেলতে পারতো।

ঠিক এই কারণে, বেশিরভাগ বিজ্ঞানী ভাইরাসকে জীবন্ত বস্তু বলে মনে করেন না।



ছবি: SARs-CoV-2 ভাইরাস

স্মরণীয়নী ?

- ১। একটি ব্যাকটেরিয়া যদি ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে ৬ ঘণ্টায় তাদের মোট সংখ্যা কত হবে?
- ২। মানুষ ছাড়া আর কোন কোন প্রাণী দুই পায়ে হাঁটে বলো দেখি?
- ৩। খাবার কিছুদিন ফেলে রাখলে, কিংবা ফ্রিজে অনেক বাসী খাবার রয়ে গেলে তার উপর যে সাদাটে ধূসর তুলোর মতো আস্তুর পড়ে খেয়াল করেছ? এগুলো আসলে কী বলতে পারো?



ଅଧ୍ୟାୟ ୧

ଆବଦ୍ୟାଂୟା ଓ ଜଳବାୟୁ

অধ্যায় ৪

আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ✓ রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুচাপ, বাতাসে আর্দ্রতা ইত্যাদির ভিত্তিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- ✓ গ্রিনহাউজ গ্যাস ও গ্রিনহাউজ ইফেক্ট: কারণ ও প্রতিকার
- ✓ অ্যাসিড বৃষ্টি
- ✓ ওজোনস্তর ক্ষয়
- ✓ জলবায়ুর উপর মানবসৃষ্ট প্রভাব

৭.১ আবহাওয়া ও জলবায়ু

শীতকালে স্কুল আগে ছুটি হয়ে গেলে তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো দুপুরে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে গল্পের বই পড়েছ। বিছানার পাশে জানালা থাকলে দুপুরে প্রতিদিন জানালা দিয়ে বিছানায় রোদ পড়তে দেখবে। শীতের দুপুরে দেখবে সূর্যের আলো ও তাপ (যাকে আমরা এক সাথে রোদ হিসেবে জানি) বিছানায় সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। আবার গরমের সময় দেখবে একই সময়ে সূর্যের আলো বিছানার উপর অনেক কম জায়গা নিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, সূর্যের আলোর দিকও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গ্রীষ্মকালে বিছানার ওপরে সূর্যের আলো যতটা খাড়াভাবে পড়ে, শীতকালে তার চাইতে অনেক বাঁকা বা তীর্যকভাবে পড়ে। আবার শীতকালে বিছানার বেশি অংশ জুড়ে সূর্যের আলো পড়লেও গরম সময়ের তুলনায় অনেক কম তাপ পাওয়া যায়।

তেমনি গ্রীষ্ম বা বর্ষায় যেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয় তার কিছু সময় (কয়েক ঘণ্টা বা দিন) আগে থেকে ভ্যাপসা গরম লাগে। এই সকল ঘটনা ঘটে আবহাওয়ার নানান পরিবর্তনের জন্য।

৭.১.১ আবহাওয়া

আবহাওয়া ও জলবায়ু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত দুটি শব্দ। প্রতিদিন টেলিভিশনের খবরে একটা অংশ থাকে আবহাওয়ার প্রতিবেদন। এছাড়া রেডিও, দৈনিক পত্রিকা এমনকি স্মার্টফোনেও আমরা প্রতিদিনের আবহাওয়ার প্রতিবেদন দেখতে পাই। এই প্রতিবেদনে আবহাওয়ার যে বিষয়গুলোর কথা জানানো হয় তার মধ্যে রয়েছে,

☑ রোদ

☑ বৃষ্টি

☑ বায়ুর তাপমাত্রা

☑ বায়ুর আর্দ্রতা

☑ বায়ুপ্রবাহের দিক

☑ বায়ুচাপ ইত্যাদি।

এগুলোকে বলা হয় আবহাওয়ার উপাদান। এগুলোর বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে আবহাওয়া কেমন হবে তা বোঝা যায়।

রোদ

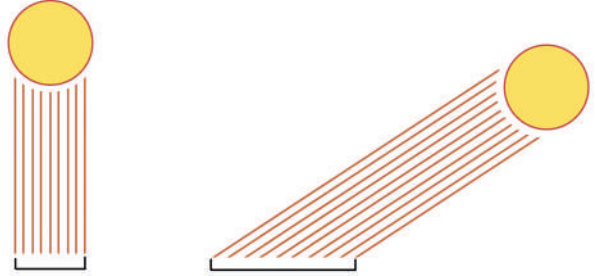


পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস সূর্য। তাপ ও আলো আকারে এই শক্তি সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসে। একে সূর্যালোক বা রোদ এবং ইংরেজিতে ইন্সলেশন (insolation) বলা হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যালোক বিভিন্ন পরিমাণে পৃথিবীতে আসে। এটা নির্ভর করে সূর্য আকাশে কত সময়ব্যাপী থাকে এবং আকাশ কতটা পরিষ্কার তার ওপর। বলো তো বছরের কোন সময় (মাস অথবা ঋতু) আকাশ বেশি সময় ধরে

পরিষ্কার ও নীল থাকে এবং কোন সময় মেঘলা থাকে?

সূর্য যদি বেশি সময় ধরে আকাশে অবস্থান করে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেই স্থানের পৃথিবীপৃষ্ঠ বেশি সূর্যালোক পাবে। কাজেই সূর্য আকাশে কত সময় ধরে অবস্থান করছে তার উপরেও সূর্যালোকের পরিমাণ নির্ভর করে। এখানে পৃথিবী পৃষ্ঠ বলতে পৃথিবীর মাটি, পানি এবং বাতাসকে বোঝানো হচ্ছে। আবার দিনের কম সময়ব্যাপী যদি সূর্য আকাশে থাকে তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠ কম সূর্যালোক পাবে। শীতকালে দেরিতে সূর্য ওঠে এবং তাড়াতাড়ি সূর্য অস্ত যায়। ফলে আকাশে সূর্যের অবস্থানকাল সংক্ষিপ্ত হয়। কম সময় ধরে সূর্যালোক পাওয়ার কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠ তুলনামূলকভাবে শীতল থাকে। তাহলে বলো তো বছরের কোন সময়ে সূর্য বেশি সময় ধরে আকাশে থাকে? তখন পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কেমন হবে?

রোদ বেশি সময়ব্যাপী এবং তীব্র হলে সেই স্থানে বাষ্পীভবনের পরিমাণও বেড়ে যায়।



ছবি: গ্রীষ্ম এবং শীতকালে সূর্যের আলোক রশ্মি পড়ার কোণ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে একই পরিমাণ সূর্যালোক বেশি জায়গা জুড়ে পড়ছে

বায়ুর তাপমাত্রা



গ্রীষ্মকালে রোদে না গিয়ে ছায়ায় বা ঘরে থাকলেও গরম অনুভূত হয়। এর কারণ তখন আমাদের চারপাশে বায়ুর তাপমাত্রা বেশি থাকে। এই তাপমাত্রা কেমন হয় তা নির্ভর করে,

- » **সূর্যের আলোর ভূমিতে পড়ার কোণের উপর** : সূর্যের আলো খাড়াভাবে পড়লে (অর্থাৎ ভূমির সাথে ৯০ ডিগ্রি বা তার কাছাকাছি কোণ হলে) সূর্যের আলো ও তাপের পরিমাণ বেশি হয় এবং ভূপৃষ্ঠ ও তার সংলগ্ন বায়ু বেশি উত্তপ্ত হয়। আবার শীতকালে সূর্যালোক ৯০ ডিগ্রি থেকে অনেক কম কোণে ভূপৃষ্ঠে পড়ার কারণে সূর্যালোকের তীব্রতা কমে যায়। ফলে বায়ুর তাপমাত্রা কমে যায় এবং ঠান্ডা অনুভূত হয়।
- » **সূর্যালোকের উপস্থিতির সময়ের উপর** : তোমরা খেয়াল করে দেখো গ্রীষ্ম এবং শীতকালের মধ্যে কোন সময়ে সূর্য বেশি সময় আকাশে দেখা যায়। সূর্যালোক যত বেশি সময়ব্যাপী কোনো স্থানে উপস্থিত থাকবে, সেই স্থানের বায়ু তত বেশি গরম হবে।
- » **বায়ুতে জলীয়বাস্পের পরিমাণ** : জলীয়বাস্প বেশি তাপ ধারণ করতে পারে। এর ফলে কোনো স্থানের বায়ুতে জলীয়বাস্পের পরিমাণ বেশি হলে সেখানে বেশি গরম অনুভূত হবে।

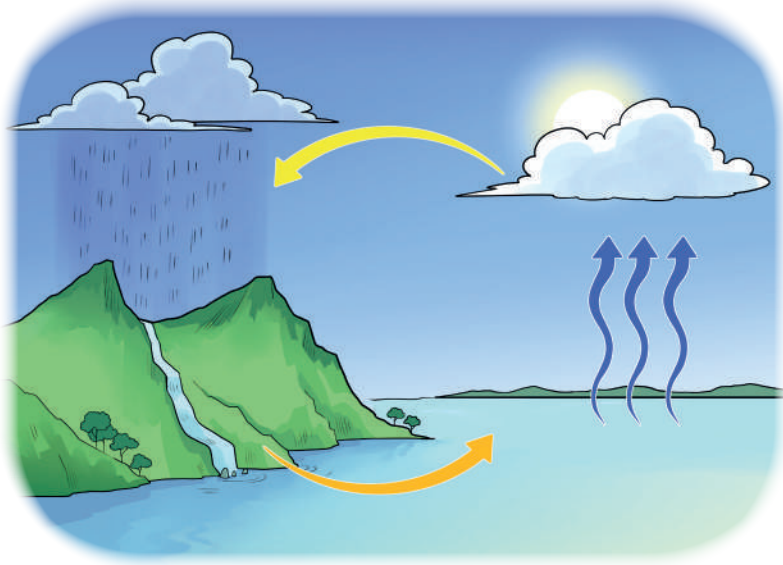
থার্মোমিটার (thermometer) দিয়ে বায়ুর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

বৃষ্টি



আবহাওয়ার একটি অন্যতম উপাদান হলো বৃষ্টি। বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। আকাশ থেকে বিভিন্ন আকারের পানির অসংখ্য ফোঁটা ঝরে পড়ে। এই পানি কোথা থেকে এসেছে?

এখন কয়েকটি ঘটনা দেখা যাক। চুলায় ভাত রান্না করার সময় অথবা পানি গরম করলে সেই পাত্র থেকে পানির বাষ্প উপরে উঠতে দেখা যায়। আবার ভেজা কাপড় দড়িতে বিশেষ করে রোদে মেলে দিলে তা শুকিয়ে যায়। এই পানি যায় কোথায়? এই পানি বাতাসের সাথে মিশে যায়। একইভাবে দিনের বেলা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত মাটি, পানি এবং উদ্ভিদ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। বাতাসে এই জলীয়বাস্প কিন্তু অনির্দিষ্ট পরিমাণে মিশে থাকতে পারে না। যে কোনো স্থানের বাতাসে জলীয়বাস্প ধারণ করার ক্ষমতা সীমিত এবং তা নির্ভর করে ঐ স্থানের তাপমাত্রার উপর। এটিকে আমরা একটি পানি খাবার গ্লাসের সাথে তুলনা করতে পারি। ঐ গ্লাসের পানি ধারণক্ষমতা নির্দিষ্ট। তাই গ্লাসে ইচ্ছেমতো পানি ঢাললে গ্লাসের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পানি গ্লাস থেকে উপচে বাইরে পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠে বাতাসের ক্ষেত্রে (পৃথিবীর বায়ুর এই স্তরকে বায়ুমণ্ডল বলা হয়) কোনো স্থানের বাতাসে জলীয়বাস্পের পরিমাণ সেখানকার বায়ুর ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে গেলে সেই অতিরিক্ত জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়ে তরল পানির ছোট ছোট কণায় রূপান্তরিত হয় এবং তা পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃষ্টি এই ফিরে আসা পানির অনেকগুলো রূপের একটি রূপ মাত্র। এক্ষেত্রে জলীয়বাস্প ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে গেলে তা ক্রমশ ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ (যা অত্যন্ত ছোট তরল পানির কণা এমনকি বরফের কণা দিয়েও গঠিত হতে পারে) এবং তারপর বৃষ্টির পানির ফোঁটায় পরিণত হয়। পানির সূক্ষ্ম কণা যখন



ছবি: বৃষ্টিপাতের উৎপত্তি এবং এর পানির পরিবর্তন

একীভূত হয়ে আরো বড় পানির কণায় পরিণত হয় তখন তা আর বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকতে পারে না এবং বৃষ্টির পানির ফোঁটা আকারে ঝরে পড়ে। পরবর্তীকালে তা নদী, নালা, খাল, বিল ইত্যাদির মাধ্যমে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। বৃষ্টিপাত পরিমাপের যন্ত্র হলো রেইন গজ (rain gauge)।

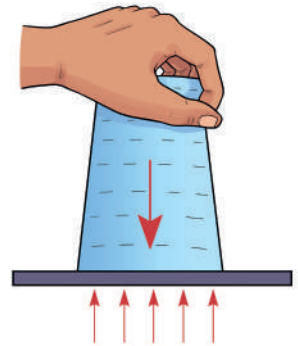
বায়ুচাপ



আমাদের চারপাশে যে বায়ু আছে তার উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা প্রভাব রয়েছে। ফলে তারও কিন্তু একটা ওজন রয়েছে এবং এই বায়ু যা কিছু স্পর্শ করে তার উপরেই চাপ প্রয়োগ করে। ভূপৃষ্ঠের উপরস্থ যে কোনো বস্তু বা স্থানের উপর বায়ুমণ্ডল একক ক্ষেত্রফলে যে চাপ প্রয়োগ করে সেটাই বায়ুচাপ। এই চাপ সবদিক দিয়ে প্রয়োগ হয়। যদি আমরা একটা পানির গ্লাস কানায় কানায় পানি

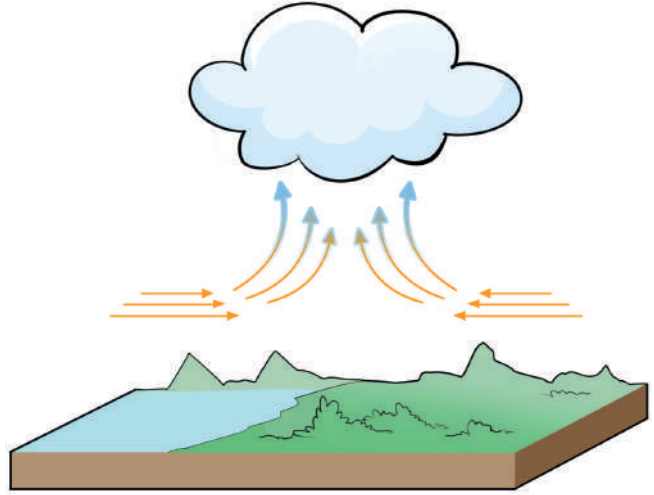
দিয়ে পূর্ণ করি এবং তার মুখের উপর একটি শক্ত কাগজ বা কার্ডবোর্ড দিয়ে আটকিয়ে গ্লাসটি উল্টাই তবে দেখা যাবে পানিসহ গ্লাসটি উল্টে থাকা সত্ত্বেও পানি পড়ে যাচ্ছে না। বায়ু সবদিক থেকে চাপ দেয় বলেই এমন হয়।

আমরা পানিতে নেমে গভীরে ডুব দিলে শরীরের উপরে যেটুকু পানি থাকে তার চাপ অনুভব করি, কারণ পানি বাতাসের তুলনায় অনেক ভারি। বায়ুমণ্ডলও আমাদের উপর চাপ প্রয়োগ করছে যা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। তবে অনেক উঁচু স্থানে গেলে বা বিমানে ভ্রমণ করার সময় বায়ুচাপের পরিবর্তন কিছুটা টের পাওয়া যায়। এই বায়ুচাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুচাপের একক হলো মিলিবার (Millibar)। বাতাসের গড় বায়ুচাপ হলো ১০১৩ মিলিবার। এর চেয়ে



ছবি: বায়ুচাপের পরীক্ষা

বায়ুচাপ বেশি হলে তাকে উচ্চচাপ এবং কম হলে নিম্নচাপ বলা হয়। বায়ুচাপ কমে গেলে বা নিম্নচাপ হলে সেই নিম্নচাপ পূরণ করার জন্য আশেপাশের অঞ্চল থেকে বাতাস ছুটে আসে। (ছবি) সেই বাতাস পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। বাতাস উপরে উঠলে সেটি শীতল হয়ে পড়ে এবং বাতাসের জলীয় বাষ্প তরল জলকণায় রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টি হিসেবে নিচে নেমে আসে। সেজন্য বাতাসের নিম্নচাপ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নির্দেশ করে। বায়ুচাপ মাপার যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার (barometer)।



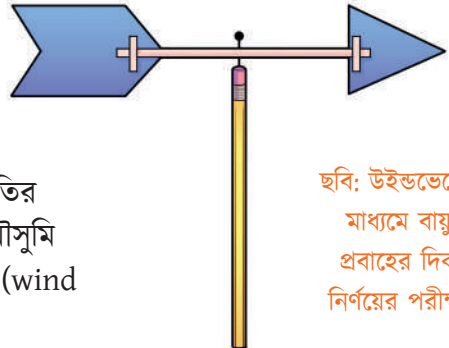
ছবি: বায়ুচাপ কমে গেলে আশেপাশের অঞ্চল থেকে ছুটে আসা বাতাস পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়

বায়ুচাপ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো,

- » **সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার তারতম্য** : যত উপরে যাওয়া হবে, বায়ুচাপ তত কমবে।
- » **বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য** : বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে বায়ুচাপ কমে এবং উষ্ণতা কমলে বায়ুচাপ বাড়ে। এই কারণে শীতকালে বাতাস তুলনামূলকভাবে শুষ্ক ও ভারি থাকে এবং উচ্চচাপ দেখা যায়।
- » **বায়ুতে জলীয়বাষ্পের তারতম্য** : বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণও বেড়ে যায়। এর ফলে বায়ুচাপ কমে যায় ও ব্যারোমিটারে নিম্নচাপ দেখায় (১০১৩ মিলিবারের কম)। কারণ বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে বায়ু আর্দ্র হয়ে যায় যা শুষ্ক বায়ুর তুলনায় হালকা।
- » **পৃথিবীর আবর্তন গতি** : পৃথিবী তার নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘোরে যাকে আবর্তন গতি বলা হয়। এর কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বায়ুচাপ কম হয়ে থাকে।

বায়ুপ্রবাহের দিক

বাতাস কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। যেমন, বাংলাদেশে শীতকালে উত্তর দিক থেকে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং বায়ুর তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়।



ছবি: উইন্ডভেনের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের পরীক্ষা

আবার গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হয়। অধিক জলীয়বাষ্পের উপস্থিতির কারণে এই বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ুর নাম মৌসুমি বায়ু। বায়ুপ্রবাহের দিক বের করার যন্ত্রের নাম উইন্ডভেন (wind vane)।

বাতাসের সাদ্রতা



বায়ুতে একক আয়তনে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি হলো বায়ুর আর্দ্রতা। এই আর্দ্রতা পরিমাপের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন,

- » **প্রকৃত আর্দ্রতা** : প্রকৃত আর্দ্রতা বলতে বোঝায় বাতাসের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ, অর্থাৎ প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে কত গ্রাম জলীয়বাষ্প রয়েছে। বাতাসের তাপমাত্রার সাথে প্রকৃত আর্দ্রতার কোনো সম্পর্ক নেই।
- » **আপেক্ষিক আর্দ্রতা** : একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন স্থানের বায়ু সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে তার তুলনায় শতকরা কত পরিমাণ আছে, তা-ই হলো আপেক্ষিক আর্দ্রতা। বাতাসের তাপমাত্রা যত বেশি হয় সেটি তত বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। বাতাসের তাপমাত্রা যদি ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাহলে এক কিউবিক মিটার বাতাস সর্বোচ্চ ৩০ গ্রাম পানি ধারণ করতে পারে। আবার বাতাসের তাপমাত্রা যদি ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাহলে এক কিউবিক মিটার বাতাস সর্বোচ্চ ১০ গ্রাম পানি ধারণ করতে পারে। কাজেই যদি কোথাও তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় এবং বলা হয় সেখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০%, তাহলে বুঝতে হবে সেই স্থানের বাতাসে প্রতি কিউবিক মিটারে ৩০ গ্রাম জলীয়বাষ্প রয়েছে এবং সেখানে আর জলীয়বাষ্প যোগ হতে পারবে না। অন্যভাবে বলা যায় বাতাসে যখন প্রতি কিউবিক মিটারে ১০ গ্রাম পানি থাকে তখন বাতাসের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে সেখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% কিন্তু বাতাসের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে সেটি মাত্র ৩৩%। আর্দ্রতা বেশি হলে সেই স্থানে ভেজা বস্তু সহজে শুকানো যায় না। বলা যেতে পারে ঘরে বর্ষাকালে যখন বাতাসের আর্দ্রতা অনেক বেশি থাকে তখন একটি ১০ফুট x ১০ফুট x ১০ফুট ঘরের বাতাসে প্রায় এক লিটার পানি থাকে।

বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয় হাইগ্রোমিটার (hygrometer) এর মাধ্যমে।

৭.১.২ জলবায়ু

জলবায়ু হলো কোনো একটি এলাকার নির্দিষ্ট সময়ের গড় আবহাওয়া। কোনো একটি এলাকার জলবায়ু বুঝতে হলে কমপক্ষে ৩০ বছরের আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের তথ্য দরকার। তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছে জলবায়ু বিষয়ে জানার প্রধান দুটি উপাদান। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আবহাওয়ার যে সকল উপাদান আছে তা একই সাথে জলবায়ুরও উপাদান (রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি)।

কোনো এলাকার জলবায়ু ব্যাখ্যা করার জন্য জলবায়ু বিজ্ঞানীরা যে তিনটি বিষয় বিবেচনা করে থাকেন তা হলো:

- (১) সেই স্থানের গড় তাপমাত্রা কত?
- (২) সেই স্থানের গড় বৃষ্টিপাত কত?
- (৩) বিভিন্ন ঋতুতে সেখানে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন কতটা হয়?

সুতরাং জলবায়ু বলতে আমরা একটি এলাকার আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের কয়েক দশকের (৩০ বছর বা তার বেশি) পরিবর্তনের ধারা (pattern) বুঝে থাকি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মানুষের সৃষ্টি করা কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে থাকে যা অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, কলকারখানা ও বিভিন্ন যানবাহন থেকে নির্গত গ্রিনহাউজ গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অনেকাংশে জড়িত। সেক্ষেত্রে যে সকল দেশে অধিক কলকারখানা এবং তেল গ্যাসচালিত যানবাহন রয়েছে সেসব দেশ অধিক পরিমাণে গ্রিনহাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত করে যা জলবায়ুর পরিবর্তনে অধিক দায়ী।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া (greenhouse effect)

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়া যেটির কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হয়ে যায়। এই নামটি এসেছে শীতপ্রধান দেশে কৃষিকাজ করার জন্য ব্যবহৃত কাচ বা অন্য স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে নির্মিত গ্রিনহাউস নামক ঘরের নাম থেকে। এই গ্রিনহাউস দিনের বেলা সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পায়, তা রাতের বেলায় একটু ভিন্নরূপে পুনরায় বিকিরণ করে, যে কারণে এ তাপ গ্রিনহাউসের বাইরে যেতে পারে না। যার ফলে গ্রিনহাউসের ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার তুলনায় বেশি থাকে। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কিছু গ্যাস সূর্যের তাপে উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের পুনরায় বিকিরণ করা তাপ শোষণ করে বায়ুর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া নামে



ছবি: শীতের দেশে গ্রীনহাউজের ব্যবহার



ছবি:
গ্রীনহাউজের
ভেতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি

পরিচিত। জলীয়বাষ্প, মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের কারণে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং এই গ্যাসগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হয়। গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণগুলো হলো:

» তেল, গ্যাস ও কয়লা পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

» বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী তথা জৈববস্তুর পচনের ফলে মিথেন বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এই মিথেন গ্যাস

গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি শক্তিশালী।

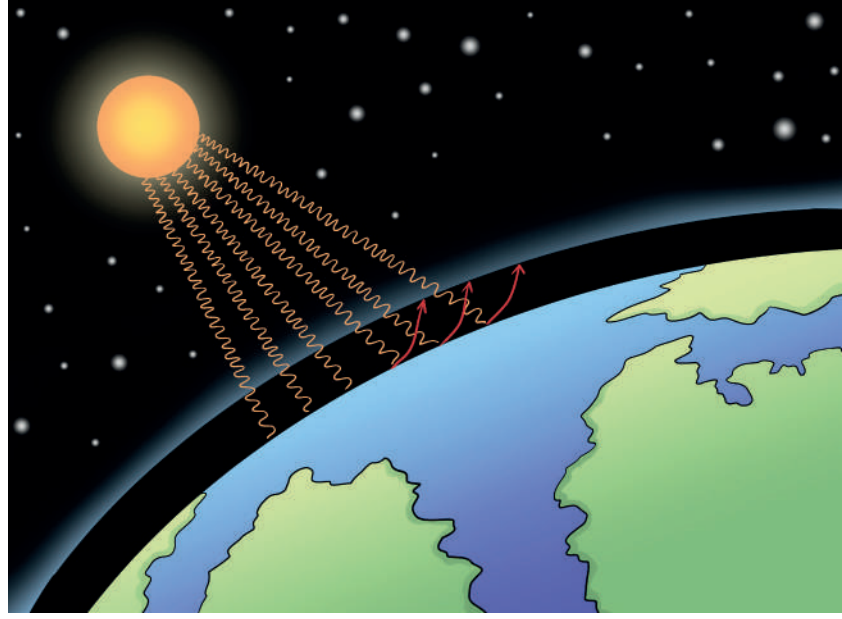
» গবাদিপশু পালন বেড়ে গেলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণও বাড়তে থাকে। গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গবাদিপশু তাদের খাদ্য হজমের কারণে প্রচুর মিথেন গ্যাস বাতাসে ছাড়ে।

» কৃষিজমিতে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহার করলে সেখান থেকে নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় অন্তত ১০ গুণ ক্ষতিকর এবং সর্বোচ্চ প্রায় ৩০০ গুণ বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম।

» বন ধ্বংস এবং গাছ কাটার ফলে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করার জন্য গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে বাতাসে মানবসৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

» কিছু যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্যাদি (যেমন, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ফোম, অ্যারোসল ইত্যাদি) থেকে এক ধরনের গ্যাস বের হয়, এদের ফ্লোরিনেটেড গ্যাস বলে। এই গ্যাসের গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় প্রায় ২৩,০০০ গুণ বেশি।

এই গ্যাসগুলোর পরিমাণ যত বাড়বে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া তত বেশি হবে। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর দুই মেরুতে (উত্তর ও দক্ষিণ মেরু) জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি অনেক ধরনের রোগজীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠায় বিভিন্ন রোগব্যাদির প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে।



ছবি: গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া

স্যাসিড বৃষ্টি

বৃষ্টির পানির সাথে অ্যাসিড বা অ্যাসিড জাতীয় উপাদান মিশ্রিত থাকলে সেটাকে অ্যাসিড বৃষ্টি বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বৃষ্টির পানির সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিড নামক তীব্র অ্যাসিড মিশ্রিত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। এমনকি তুষার, কুয়াশা, শিলা বৃষ্টির বরফ খণ্ড, ধূলিকণার সাথেও কঠিন বা তরল অবস্থায় অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো বৃষ্টির পানি, কুয়াশা, তুষার ইত্যাদিতে এই অ্যাসিড আসলো কী করে? বিভিন্ন মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে নির্গত সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড বাতাসে উপস্থিত জলীয়বাষ্প, অক্সিজেন এবং অন্যান্য রাসায়নিকের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি হয়। তারপর তা পানি এবং অন্যান্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের সামান্য অংশ প্রাকৃতিক উৎস (যেমন, আগ্নেয়গিরি) থেকে সৃষ্টি হলেও অধিকাংশ আসে মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উৎস থেকে। উৎসগুলো হলো:

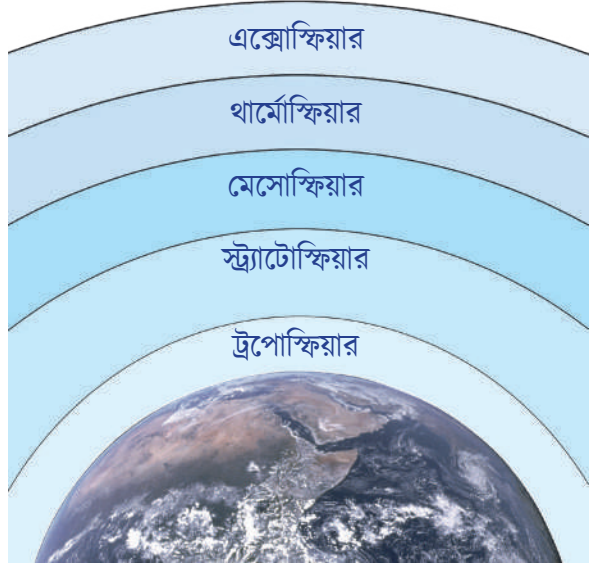
- » বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি; যেমন, তেল, গ্যাস বা কয়লা (বাতাসের ২/৩ অংশ সালফার ডাই অক্সাইড এবং ১/৪ অংশ নাইট্রোজেন অক্সাইড বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেনারেটর থেকে নির্গত হয়।)
- » বিভিন্ন যানবাহন এবং ভারি যন্ত্রপাতি
- » বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী, তেল শোধনাগার এবং অন্যান্য কলকারখানা

বায়ু এসব উৎস থেকে নির্গত দূষণকারী গ্যাস ও অন্যান্য কণাকে অনেক দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং সেখানে অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটতে পারে। এর ফলে দূষণকারী দেশ ছাড়াও দূরের অন্য দেশে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়ে সেই এলাকার ক্ষতি হতে পারে। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে যে সকল ক্ষতি হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হলো:

- » মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনধারণ কঠিন করে তোলে।
- » উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের ক্ষতি হয়।
- » মাটির গুণাগুণ (যা উদ্ভিদ এবং মাটির মধ্যে বসবাসকারী অন্যান্য অণুজীবের জন্য প্রয়োজন) নষ্ট হয়ে যায়।
- » বিভিন্ন ধাতু নির্মিত যন্ত্রপাতি, অন্যান্য স্থাপনা এমনকি দালানকোঠারও ক্ষতি হয়ে থাকে। অ্যাসিড বৃষ্টির পানি ধাতু ও কংক্রিটের সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলো ক্ষয় করতে থাকে।

ওজোনস্তর ফয়

সূর্য থেকে যে অতিবেগুনি রশ্মি নির্গত হয় তা মানুষসহ জীবজগতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডলে ওজোন নামক এক ধরনের গ্যাসের একটি আবরণ থাকায় এই ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরে (স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার) এই ওজোন গ্যাসের আবরণটি রয়েছে যা ওজোনস্তর নামে পরিচিত। এই স্তর সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু কিছু দূষণকারী উপাদানের উপস্থিতির কারণে এই স্তর ক্ষয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে জীবজগতের ক্ষতি করছে। ওজোনস্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী দূষণকারী উপাদানগুলো হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, হাইড্রো-ক্লোরো-ফ্লোরো-কার্বন ইত্যাদি। ওজোনস্তরের ক্ষয়ের ফলে নিম্নরূপ ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ করা যায়,



ছবি: বায়ুমণ্ডলের স্তর

- » **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব :** ওজোনস্তর ক্ষয়ের ফলে মানুষ ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির সরাসরি স্পর্শে আসে। ফলে তাদের মধ্যে নানানরকম শারীরিক সমস্যা যেমন, চর্মরোগ, ক্যান্সার, সূর্যের তাপে চামড়া পোড়ার মতো লাল হয়ে যাওয়া, চোখে ছানি পড়া, তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাওয়া, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখা দেয়।
- » **প্রাণীর উপর প্রভাব :** অতিবেগুনি রশ্মির সরাসরি স্পর্শে প্রাণীদের চোখ ও চামড়ার ক্যান্সার হয়ে থাকে।
- » **উদ্ভিদের উপর প্রভাব :** শক্তিশালী অতিবেগুনি রশ্মি গাছের বৃদ্ধি কমিয়ে দিতে পারে, খাদ্য তৈরি (একে সালোকসংশ্লেষণ বলা হয়) এমনকি ফুল ফোটার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে বনের গাছপালাগুলোকে এই ক্ষতিকর প্রভাব বহন করতে হয়।
- » **জলজ ও সামুদ্রিক জীবের উপর প্রভাব :** অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী (যেগুলো প্ল্যাংকটন নামে পরিচিত) অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের খাদ্যের উৎস হলো এই প্ল্যাংকটন। এগুলো ধ্বংস হলে জলজ জীবও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৭.১.৩ জলবায়ুর উপর মানবসৃষ্ট প্রভাব

মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে পুরো পৃথিবীর
জলবায়ুর উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে।

এই ক্ষতি হচ্ছে মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, ওজোনস্তরের ক্ষয়, বাতাসে
ভাসমান ক্ষুদ্র কণা (এগুলোকে এরোসল বলা হয়) এবং গাছপালা কেটে বন
পরিষ্কার করে ফেলার মাধ্যমে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা এবং
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে যায় যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে যে
সকল ঘটনা ঘটে তা নিম্নরূপ:

- » মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- » ভারী বৃষ্টি এবং শক্তিশালী ঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কিছু কিছু জায়গায় বন্যা হচ্ছে
এবং পানির গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। আবার কিছুকিছু স্থানে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা কমে
যাচ্ছে।
- » ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপের দক্ষিণ এবং মধ্য অঞ্চলগুলোতে নিয়মিত গরম আবহাওয়া
দেখা যাচ্ছে, খরা হচ্ছে ও বনে আগুন ধরে যাচ্ছে।
- » বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে
বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন: ঝড়, ভারি বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি) সম্মুখীন
হচ্ছে।
- » অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারায় পৃথিবী
থেকে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

অনুশীলনী ?

- ১। উঁচু পাহাড়ের উপরে বায়ুচাপ কি বেশি হবে নাকি কম?
- ২। তোমার আশপাশের মানুষদের কিংবা কলকারখানার কোন কোন কর্মকাণ্ড
বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া বাড়াতে কাজ করছে? লক্ষ করে দেখো।



অধ্যায় ৮

পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং এর
ব্যাপ্তিক প্রভাব

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ✓ পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
- ✓ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ
- ✓ ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার, সতর্কতা এবং সংরক্ষণ কৌশল
- ✓ পরীক্ষার সাহায্যে ধাতু এবং অধাতুর তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরিমাপন
- ✓ পরীক্ষার সাহায্যে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়
- ✓ ধাতু ও অধাতুর আকার বিকৃতি
- ✓ শীতলীকরণ (cooling) প্রক্রিয়া
- ✓ পরীক্ষামূলক কাজের সময় নিরাপত্তা এবং সতর্কতা

৮.১ পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ

তোমরা আগেই জেনেছ যে পদার্থ স্থান দখল করে ও তার ভর রয়েছে এবং প্রকৃতিতে পদার্থকে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়—এই তিনটি অবস্থায় পাওয়া যায়। পদার্থের এরকম তিনটি অবস্থা ছাড়াও তার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন, ঘনত্ব, দ্রাব্যতা, দৃঢ়তা, নমনীয়তা, তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, চৌম্বকত্ব ইত্যাদি।

ঘনত্ব

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে একক আয়তনে বস্তুর ভরকে ঘনত্ব বলে। ঘনত্ব বস্তুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্ব বিভিন্ন রকম, কোনোটি বেশি কোনোটি কম। যেমন লোহা, তামা, পিতল এরকম ধাতব পদার্থের ঘনত্ব বেশি, কাঠ বা প্লাস্টিকের ঘনত্ব তার তুলনায় কম এবং বাতাসের ঘনত্ব সবচেয়ে কম।

দ্রাব্যতা

পদার্থের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার দ্রাব্যতা, যে বিষয়টি সম্পর্কে তোমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত জানতে পারবে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয় কিন্তু তেলে সহজে দ্রবীভূত হয় না। আবার নেইল পলিশ পানিতে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু অ্যাসিটোনে খুব সহজে দ্রবীভূত হয়।

দৃঢ়তা ও নমনীয়তা

যখন তুমি বিভিন্ন বস্তুকে হাত দিয়ে চাপ দেবে তখন দেখতে পাবে সেগুলোর মধ্যে কিছু সহজেই সংকুচিত হয়ে আসছে এবং কিছু খুবই শক্ত, যেগুলোকে সহজে সংকুচিত করা যাচ্ছে না। এই সংকোচন ধর্মের মাধ্যমেই আমরা বলি কোনো পদার্থ নরম, কোনোটি শক্ত, কোনোটি নমনীয়, কোনোটি আবার অনমনীয়। নিচের কাজের মাধ্যমে এই বিষয়টি আরও সহজে বুঝতে পারবে:



কাজ: একটি ধাতব চাবি নাও এবং সেটার সাহায্যে এক টুকরা কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, পাথর, মোম, চক, রাবারসহ যেকোনো বস্তুর উপর দাগ দেওয়ার চেষ্টা করো। কিছু বস্তুর উপর তুমি সহজেই দাগ দিতে পারবে এবং কিছু বস্তুতে সহজে পারবে না। এখন, তোমার পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে শক্ত, নরম, নমনীয় ও অনমনীয় পদার্থের একটি ছক তৈরি করো। যেসব পদার্থ সহজে সংকুচিত এবং দাগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে সেগুলোকে নরম এবং যেগুলো সহজে সংকুচিত হয়নি এবং দাগ দেওয়া খুব কঠিন মনে হয়েছে সেগুলোকে শক্ত বস্তু বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোম নরম, অন্যদিকে লোহা হলো শক্ত পদার্থ।



তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন পদার্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। যে সকল পদার্থে তাপ সহজে পরিবহন করা যায় তাদেরকে তাপ পরিবাহী পদার্থ এবং যে সকল পদার্থে তাপ সহজে পরিবহন করা যায় না তাদেরকে তাপ অপরিবাহী পদার্থ বলা হয়। একইভাবে যেসব পদার্থে বিদ্যুৎ সহজে পরিবহন করা যায় তাদেরকে বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ এবং যে সকল পদার্থে বিদ্যুৎ সহজে পরিবহন করা যায় না সেগুলোকে বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ বলা হয়। সোনা, রূপা, তামা কিংবা অ্যালুমিনিয়াম একই সঙ্গে তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থের উদাহরণ। আবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ, ফসফরাস ইত্যাদি তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থের উদাহরণ।

চৌম্বকত্ব

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই চুম্বক দেখেছ, না হয় ব্যবহার করেছ। কিছু কিছু পদার্থের চৌম্বকত্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো অন্য চৌম্বকীয় পদার্থকে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ করতে পারে। লোহা, নিকেল কিংবা কোবাল্ট হচ্ছে চৌম্বকীয় পদার্থের উদাহরণ।

৮.২ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পদার্থ শনাক্তকরণ

যেহেতু বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই সেগুলো ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন পদার্থকে শনাক্ত করতে পারি। যেমন কোনো পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হলে আমরা বলতে পারব সেটি নিশ্চয়ই একটি চৌম্বকীয় পদার্থ। যদি সেটি তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবহন করে সেটি সম্ভবত এক ধরনের ধাতব পদার্থ। যদি নির্দিষ্ট কোনো ধরনের তরলে দ্রবীভূত হয়, তাহলেও আমরা পদার্থটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারব। পদার্থের ঘনত্বও আমাদেরকে পদার্থ শনাক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

পদার্থের বৈশিষ্ট্য জানার মাধ্যমে সঠিক কাজে সঠিক জিনিস ব্যবহার

তুমি যদি বাড়িঘর বানাতে চাও তাহলে ইট, পাথর আর লোহার দরকার হয়; যদি নৌকা বানাতে চাও, তাহলে কাঠের প্রয়োজন হবে। আবার অ্যালুমিনিয়াম তাপ পরিবাহী এবং সহজলভ্য বলে রান্নার কাজে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য আমরা বিদ্যুৎ পরিবাহী তামার তার ব্যবহার করি। আবার বই ছাপানোর জন্য কাগজ কিংবা শিশুদের খেলনা তৈরি করার জন্য ব্যাপকভাবে হালকা কিন্তু টেকসই প্লাস্টিক ব্যবহার করি। এভাবে দেখা যায় প্রতিটি জিনিসেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য জানার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক কাজে ব্যবহার করা যায়।

৮.৩ ধাতু ও অধাতু

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সেগুলো কিছু মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই মৌলিক পদার্থগুলোর সবগুলোকেই ধাতু অথবা অধাতুতে ভাগ করা যায়। সুতরাং ধাতু এবং অধাতু সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন তোমরা ধাতু এবং অধাতুর কিছু ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে।

ধাতুসমূহের ভৌতধর্ম

ধাতুগুলো সাধারণত উচ্চ ঘনত্বের, চকচকে এবং তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয়ে থাকে। সকল ধাতু সাধারণত কঠিন অবস্থায় থাকে, তবে পারদ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কারণ সাধারণ তাপমাত্রায় এটি তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম নরম তাই চাকু দিয়ে কাটা যায়, এছাড়া বেশির ভাগ ধাতুই শক্ত। ধাতু ঘাতসহ এবং নমনীয় বলে সেগুলোকে চাপ দিয়ে পাত কিংবা টেনে লম্বা তারে পরিণত করা যায়। সোনা, রূপা, লোহা কিংবা অ্যালুমিনিয়াম কয়েকটি পরিচিত ধাতুর উদাহরণ।



অধাতুসমূহের ভৌতধর্ম

অধাতুগুলো ধাতুর মতো ভৌতধর্ম প্রদর্শন করে না। যেমন, এগুলো চকচক করে না, সাধারণত তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী, এবং ভঙ্গুর বলে ঘাতসহ প্রসারণশীল নয় তাই চাপ দিয়ে পাত কিংবা টেনে লম্বা তার তৈরি করা যায় না। এগুলোর ঘনত্ব কম, এবং নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের মতো অনেক অধাতু সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। কার্বন (কয়লা) আমাদের পরিচিত একটি অধাতু।

৮.৩.১ ধাতুর বিভিন্ন ধর্ম ও তার পরীক্ষা

চকচকে ডাব



কাজ: অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র, প্লাস্টিকের স্কেল, কাঠের স্কেল এবং ইস্পাতের স্কেল নাও। এগুলোকে সূর্যালোকে রেখে দাও। তারপর লক্ষ করে দেখো কোনগুলো চকচক করে এবং কোনগুলো করে না। পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো একটি ছকে লেখো।

তাপ পরিবাহিতা

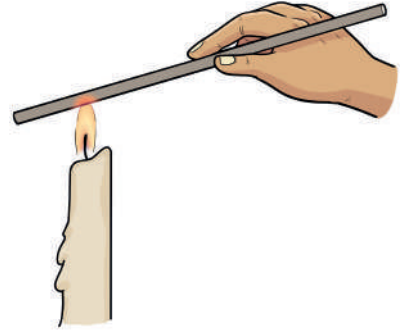
তাপ পরিবাহিতা বলতে কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে অথবা সংস্পর্শে থাকা দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে তাপের আদান-প্রদান ঘটাকে বোঝায়। তাপ সব সময় বেশি তাপমাত্রা থেকে কম তাপমাত্রায় পরিবাহিত হয়। এই পরিবহনের জন্য যদি সুপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাপ তাড়াতাড়ি প্রবাহিত হবে। যদি তাপ অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাপের প্রবাহ হবে ধীরে ধীরে। অধাতুর তুলনায় ধাতুগুলো সাধারণত তাপ-সুপরিবাহী, সেজন্য সেগুলো তাপ পরিবহনে খুবই কার্যকর। ধাতুগুলোর তাপ পরিবাহিতার প্রমাণ হিসেবে তুমি নিচের পরীক্ষাটি করে দেখতে পারো:



প্রয়োজনীয় উপকরণ: অ্যালুমিনিয়াম বা যেকোনো ধাতব দণ্ড অথবা পাতলা ধাতব তার, দিয়াশলাই এবং মোমবাতি।

কাজ: প্রথমে মোমবাতিটি জ্বালাও। এবার সাবধানে ধাতব দণ্ড বা তারটির এক প্রান্তে হাত দিয়ে ধরে অপর প্রান্ত মোমবাতির আগুনে ধরো। এভাবে, যতক্ষণ না হাতে গরম অনুভব করো, তারটি ধরে থাকো।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন তুমি তোমার হাতে ধরা প্রান্তে গরম অনুভব করেছ? ধাতব দণ্ড বা তার তাপ সুপরিবাহী বলে মোমবাতি-শিখার প্রান্তে শোষণ করা তাপ তোমার ধরে রাখা প্রান্তে পরিবাহিত হয়েছে। আসলে সব ধাতুই তাপ সঞ্চালন করে।



তাপ পরিবাহী হিসেবে ধাতুর ব্যবহার

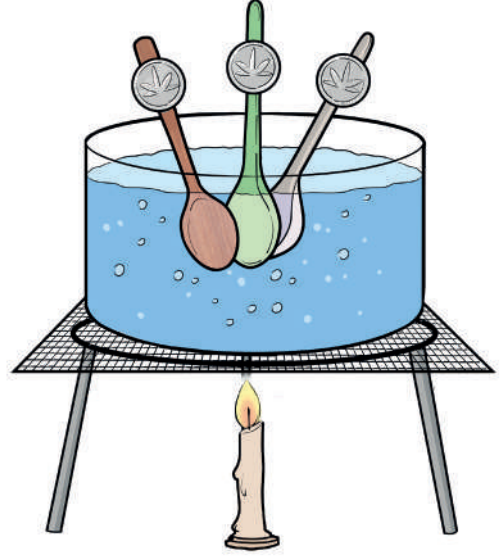
ক), রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, সোলার প্যানেল এগুলোতে তাপের পরিবহন খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই ধরনের যন্ত্রে নানা ধরনের তাপ সুপরিবাহী ধাতু ব্যবহার করা হয়।

খ) ইলেকট্রনিকস, প্রকৌশল, ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা যন্ত্র, গৃহস্থালির যন্ত্রপাতির শিল্পে এবং বিশেষ করে নির্মাণশিল্পে ধাতু ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।



কাজ: ভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা যে ভিন্ন নিচের পরীক্ষাটি দিয়ে তুমি সেটি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি: মোটামুটি একই আকারের একটি কাঠের চামচ, একটি প্লাস্টিকের চামচ, একটি ধাতব চামচ, ৩টি এক টাকার কয়েন, পানি গরম করার জন্য একটি পাত্র, এক গ্লাস পানি, তাপ দেওয়ার জন্য মোমবাতি বা অন্যকিছু, মোম, দিয়াশলাই এবং সময় মাপার জন্য যেকোনো একটি ঘড়ি।



কাজ: সামান্য তাপ দিয়ে মোম নরম করো। সবগুলো চামচের হাতলে সামান্য পরিমাণে নরম মোম লাগাও। এখন কয়েনগুলো চামচের ওপর মোমের গায়ে এমনভাবে চাপ দিয়ে বসাও যাতে কয়েনগুলো মোমের গায়ে লেগে থাকে। এবার চামচগুলো এমনভাবে পাত্রে ডুবাও যেন কয়েনগুলো পাত্রের উপরের অংশের বাইরে থাকে। তারপর মোমবাতি বা অন্য কিছু দিয়ে পাত্রটিতে তাপ দিতে থাকো।

চামচের সঙ্গে আটকে থাকা কয়েনগুলোর অবস্থা এবার পর্যবেক্ষণ করো। কয়েনগুলো কি আলাদা হয়ে গেছে? যদি তাই হয় তবে কোনটি প্রথমে আলাদা হয়েছে? আলাদা হতে কত সময় নিয়েছে? অন্যগুলো আলাদা হতে কত বেশি সময় নিয়েছে? নিঃসন্দেহে দেখবে ধাতব চামচ থেকে প্রথমে কয়েনটি আলাদা হয়েছে। যেহেতু ধাতব চামচ থেকে প্রথমে আলাদা হয়ে গেছে, তার অর্থ ধাতব চামচটি বাকি দুটি (কাঠ ও প্লাস্টিক) থেকে বেশি তাপ পরিবাহী।

গরম পানি থেকে তাপ পরিবাহিত হয়ে ধাতব চামচের মোমে কাঠ বা প্লাস্টিকের চামচের চেয়ে দ্রুত পৌঁছেছে। সে কারণে ধাতব চামচের মোম দ্রুত গলে গিয়েছে এবং কয়েনটি আলাদা হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, প্লাস্টিকের পরিবাহিতা অন্যগুলোর চেয়ে কম হওয়ায়, তাপ খুব ধীরে ধীরে উষ্ণ প্রান্ত থেকে শীতল প্রান্তে পৌঁছেছে। যার ফলে দেখবে প্লাস্টিকের চামচের মোম গলতে সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে এবং সবার শেষে এ চামচের কয়েনটি আলাদা হয়েছে।

৮.৩.২ ধাতু ও অধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

প্রায় সব ধাতুই বিদ্যুৎ পরিবাহী হলেও সেগুলোর পরিবহন ক্ষমতা আলাদা। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, রূপা সবচেয়ে ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ এবং তামা ও অ্যালুমিনিয়ামও যথেষ্ট ভালো মানের পরিবাহী। তবে রূপার মূল্য খুব বেশি হওয়ায় বৈদ্যুতিক তার হিসেবে সেটি ব্যবহৃত হয় না, তার পরিবর্তে তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়।



কাজ: আমরা খুব সহজেই বিভিন্ন পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরীক্ষা করতে পারি। সেটি করার জন্য তোমার দরকার হবে একটি ব্যাটারি, কিছু তামার তার এবং একটি ডায়োড। (তুমি ইচ্ছা করলে ডায়োডের বদলে একটি টর্চলাইটের বাস্বও ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু আজকাল নানা রংয়ের ডায়োড খুবই সহজে অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।) এবারে ছবিতে দেখানো উপায়ে তুমি সার্কিট তৈরি করে ডায়োডটি ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত করে সেটি জ্বালাও। তুমি দেখবে ডায়োডের ভেতর দিয়ে শুধু একদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বলে ব্যাটারির এক দিকে সংযুক্ত করলে ডায়োডটি জ্বলবে, অন্যদিকে সংযুক্ত করলে জ্বলবে না।



যেহেতু তামা বৈদ্যুতিক পরিবাহী, তাই এটি ব্যাটারির বিদ্যুৎকে ডায়োডের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করতে পারে এবং এই কারণে ডায়োড জ্বলে ওঠে। যদি তামার তারটি বৈদ্যুতিক পরিবাহী না হতো তাহলে এটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারত না এবং ডায়োড জ্বলে উঠত না।

এবারে তুমি ছবিতে দেখানো উপায়ে তামার তারের অংশটুকুতে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সূতা, কাগজ, রবার, প্লাস্টিক, কাঠ এমন কী পানি দিয়েও পরীক্ষা করে দেখতে পারো কী হয়! দেখবে কোথাও কোথাও ডায়োড জ্বলছে; কোথাও কোথাও জ্বলছে না। যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু দিয়ে সার্কিট সম্পূর্ণ করার পরেও ডায়োড না জ্বলে, তাহলে বুঝতে হবে সেই বস্তুটি বিদ্যুৎ পরিবাহী না।

৮.৩.৩ বনপ্রয়োগে ধাতুর পরিবর্তন

তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের স্কুলের ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ শুনেছ। স্কুলের ধাতব ঘণ্টার জায়গায় যদি একটা প্লাস্টিক কিংবা কাঠের ঘণ্টা ঝোলানো হতো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি চমৎকার ঢং ঢং ঘণ্টা শুনতে পেতে না!

আঘাত করা হলে এই বিশেষ ঢং ঢং বা বন বন শব্দ তৈরি করা ধাতুর একটি ধর্ম। ধাতুকে আঘাত করে পাত তৈরি করা যায়। তুমি শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে যে এক ঘনসেন্টিমিটারের এক টুকরা সোনাকে একটা ফুটবল মাঠের সমান অতি সূক্ষ্ম পাতে বিস্তৃত করা যায়! তোমাদের রান্নাঘরে গিয়ে পুরনো অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি কিংবা কেতলি পরীক্ষা করে দেখলে দেখবে এটি নানা জায়গায় তোবড়ানো এবং এবড়োথেবড়ো। তার কারণ ব্যবহারের সময় আঘাত পেয়ে এর আকারের পরিবর্তন হয়েছে। ধাতুর জন্য এটি খুবই সাধারণ একটি প্রক্রিয়া। ধাতু না হয়ে যদি ডেকচি কিংবা কেতলি কাচ অথবা চিনামাটির তৈরি হতো তাহলে এটি ঘটত না। তোমরা কি তোমাদের চারপাশে যা দেখো তার ভেতর থেকে আঘাত পেয়ে অথবা বল প্রয়োগ করে ধাতুর আকার পরিবর্তনের আরও কিছু উদাহরণ বের করতে পারবে?

৮.৪ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক

৮.৪.১ গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক

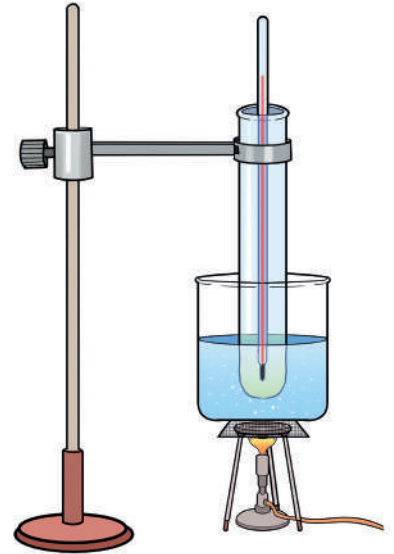
যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তার অবস্থা পরিবর্তন করে তরল পদার্থে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে ওই কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক বলে। আবার যে তাপমাত্রায় একটি তরল পদার্থ তার অবস্থা পরিবর্তন করে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় তাকে হিমাঙ্ক বলে। প্রকৃতপক্ষে গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক আসলে একই তাপমাত্রা। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় পানির তাপমাত্রা কমে কমে যখন ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়, তখন সেটি জমে বরফ হতে শুরু করে। আবার জমাটবাধা বরফের তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে যখন সেটি যখন ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়, তখন সেটি গলে পানি হতে শুরু করে।

মোমের গলনাঙ্ক ৫৭°C। তুমি কিভাবে সেটি বের করবে? অথবা এটা দিয়ে কী বোঝায়? এটি বের করতে হলে তাপমাত্রা মাপার জন্য একটি থার্মোমিটার প্রয়োজন। যেহেতু জ্বর মাপার থার্মোমিটার শুধু তোমার শরীরের তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রা মাপতে পারে, কাজেই তোমাকে ০ ডিগ্রি থেকে ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপতে পারে সেরকম একটি থার্মোমিটার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তোমার শিক্ষক তোমাকে সাহায্য করতে পারেন এবং স্কুলের ল্যাবরেটরিতে তোমাদের পরীক্ষাটি করে দেখাতে পারেন। যেহেতু গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক একই তাপমাত্রা কাজেই এই পরীক্ষায় একই সঙ্গে গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক বের করা হবে। যদি দুটির মধ্যে একটু খানি পার্থক্য পাওয়া যায় তাহলে সেগুলোর গড় নিলে প্রকৃত তাপমাত্রার কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যাবে।



কাজ:

১. একটি টেস্টটিউবে কিছু মোমের ছোট টুকরো নাও।
২. একটি বিকারে বা অন্য কোনো পাত্রে খানিকটা পানি নাও এবং তারজালি ব্যবহার করে একে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে স্পিরিট ল্যাম্প বা তাপ দেওয়ার উপযোগী অন্য কিছুর ওপরে বসানো।
৩. একটি দণ্ডের সাহায্যে মোমসহ টেস্টটিউবটি পানিতে নিমজ্জিত করো এবং একটি থার্মোমিটার টেস্ট টিউবে প্রবেশ করানো।
৪. স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বিকারের তলদেশে তাপ প্রদান করো।
৫. থার্মোমিটারের পাঠ পর্যবেক্ষণ করো এবং টেস্টটিউবে থাকা মোমের অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করো।



তুমি দেখবে যে থার্মোমিটারের তাপমাত্রার পাঠ বৃদ্ধি পাচ্ছে। থার্মোমিটারের পাঠ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছালে মোমের অবস্থা সাবধানতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করো।

৬. মোম যখন গলতে শুরু করবে, থার্মোমিটারের পাঠ লক্ষ্য করো। এটি মোমের গলনাঙ্ক এবং এর মান ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি হওয়ার কথা। তবে মনে রেখো, গলনাঙ্কের মান বস্তুর মধ্যে যে অপদ্রব্য থাকে তার উপর নির্ভর করে একটু কম হতে পারে।

৭. পুরো মোমটি গলে যাওয়ার পর গলিত মোমের তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করবে।

৮. থার্মোমিটারসহ টেস্টটিউবটির নিচ থেকে বিকার, তারজালি এবং ল্যাম্প সরিয়ে নাও।

৯. এবারে গলিত মোমের তাপমাত্রা কমতে থাকবে। থার্মোমিটারের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করো, লক্ষ্য করো কোন তাপমাত্রায় মোম জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।

১০. যে তাপমাত্রায় মোম জমতে শুরু করবে, সেটি হচ্ছে মোমের হিমাঙ্ক।

আলাদা আলাদাভাবে বের করা গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্কের গড় নিয়ে তোমার ফলাফলটি নির্ধারণ করো।

৮.৪.২ স্ফুটনাঙ্ক

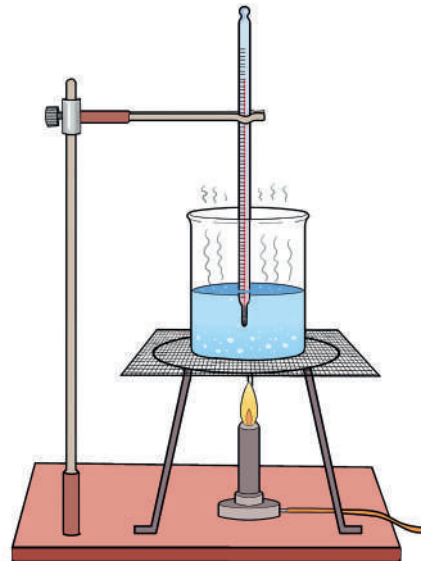
যে তাপমাত্রায় একটি তরল তার অবস্থার পরিবর্তন করে গ্যাসে পরিণত হয় তাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে। তোমরা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে কেতলিতে বা অন্য কোনো পাত্রে পানি ফুটাতে দেখেছ, তখন পানি বাষ্পে পরিণত হতে থাকে। যে তাপমাত্রায় পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাকে পানির বাষ্পীকরণ বিন্দু বা স্ফুটনাঙ্ক বলে। পানির স্ফুটনাঙ্ক হলো ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পানির মতোই প্রতিটি তরল পদার্থেরই একটি নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক রয়েছে।

তোমাদের শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে গলনাঙ্ক বের করার মতো তোমরা পানির স্ফুটনাঙ্কও বের করতে পারবে।



কাজ:

১. ছবিতে যেরকম দেখানো হয়েছে সেভাবে একটি বিকার বা পাত্রের অর্ধেকের মতো পানি নাও।
২. বিকার বা পাত্রটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের বা তাপ দেওয়া যায় এমন কিছু ওপর বসাও। থার্মোমিটার একটা দণ্ডের সাহায্যে বিকারের পানিতে নিমজ্জিত করো।
৩. এখন তাপ প্রদান করো এবং থার্মোমিটারের তাপমাত্রা লক্ষ্য করতে থাকো।
৪. থার্মোমিটারের তাপমাত্রা যখন ৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠবে তখন বিকার বা পাত্রের পানির অবস্থা সাবধানতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে থাকো।



প্রথমে পানিতে দ্রবীভূত বাতাস বুদবুদ আকারে বের হয়ে আসবে, সেগুলো বাষ্প নয়।

৫. পানি যখন ফুটতে শুরু করবে, তখন থার্মোমিটারের তাপমাত্রা লক্ষ্য করো। এটিই হচ্ছে পানির স্ফুটনাঙ্ক। তুমি যদি বিশুদ্ধ পানি নিয়ে থাকো, তাহলে স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছকছি হবে।

৬. পানিতে অন্য কিছু দ্রবীভূত থাকলে তার স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন হতে পারে, সেটি পরীক্ষা করার জন্য পানিতে এক চামচ লবণ গুলে পানির স্ফুটনাঙ্ক বের করে দেখো সেটি কত হয়।

তরলের স্ফুটনাঙ্ক আসলে বাতাসের চাপের ওপর নির্ভর করে। পাহাড়ের ওপরে বা এরকম অনেক উঁচু স্থানে বাতাসের চাপ কম বলে সেখানে পানি কম তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে তাই রান্না করতে বেশি সময় নেয়। আবার প্রেশার কুকারে কৃত্রিমভাবে বাতাসের চাপ বাড়িয়ে পানির স্ফুটনাঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে দ্রুত রান্না করা সম্ভব হয়।

স্রুশীলনী ?

- ১। রান্নাঘরের বিভিন্ন আকৃতির পাত্র কোনটা কোন রান্নায় কাজে লাগে লক্ষ্য করে দেখো তো! এদের আকৃতি ভিন্ন হবার কারণ কী বলতে পারো?
- ২। শীতকালে নারিকেল তেল জমে শক্ত হয়ে যায় কেন বলো তো?



অধ্যায় ৯ বল ও শক্তি

ছবিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার
সানজিদা ইসলাম

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ বল
- ☑ ঘর্ষণ বল
- ☑ ঘর্ষণ বল বাড়ানো ও কমানোর উপায়
- ☑ সরল যন্ত্র

৯.১ বল

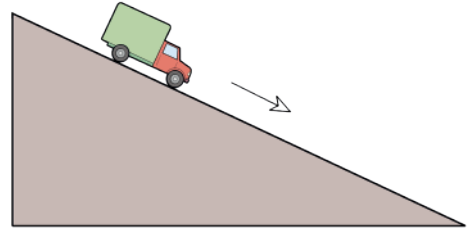
আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় অনেকভাবে ‘বল’ শব্দটা ব্যবহার করি, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় বল কথাটার একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে! সত্যি কথা বলতে কি তোমরা এর মধ্যে বিজ্ঞানের ভাষায় বল বলতে কী বোঝায় সেটা জেনে গেছ:

যেটা কোনো কিছুর গতি পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ কোনো কিছুর মধ্যে ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে, সেটাই হচ্ছে বল (force)।

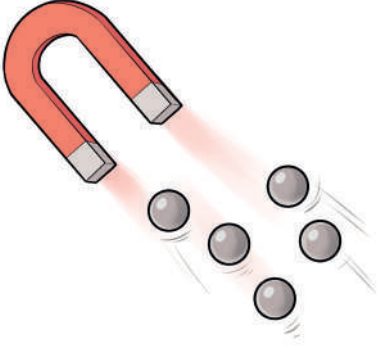
তোমরা যখন একটু উপরের ক্লাসে নিউটনের জগদ্বিখ্যাত সূত্রগুলো পড়বে, তখন দেখতে পাবে বলকে কীভাবে ত্বরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা ও পরিমাপ করা যায়!

বস্তুর গতি পরিবর্তন ছাড়াও বল আরও একটি কাজ করতে পারে, সেটি অনেক সময় একটা বস্তুর আকার পরিবর্তন বা বিকৃত করতে পারে। তোমরা বলপ্রয়োগ করে একটা রডকে বাঁকা করতে পারবে, একটা স্প্রিংকে লম্বা করতে পারবে কিংবা একটা তারকে প্যাঁচাতে পারবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিমুহূর্তে বল ব্যবহার করতে থাকি। কখনও কখনও আমরা সরাসরি বল প্রয়োগ করি, কখনও কখনও কোনো একটা যন্ত্র দিয়ে বল ব্যবহার করি, আবার কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয় বল থেকে নিজেদের রক্ষা করি।

বল সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের বল নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, সে জন্য আমাদের সঠিক পরিমাণ বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। তোমরা কি জানো প্রকৃতিতে আমাদের জন্য অত্যন্ত নিখুঁত পরিমাণ বল প্রয়োগ করার ব্যবস্থা রয়েছে?



ছবি: একটা ঢালের কোণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে আমরা একটা বস্তুর ওপর বেশি কিংবা কম বল প্রয়োগ করতে পারি।



ছবি: চুম্বকের আকর্ষণ
বলের একটি উদাহরণ

সেটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ বল। তুমি যদি কোনো কিছু উপর থেকে নিচে ফেলো, তাহলে তার ওপর সব সময় মাধ্যাকর্ষণের এই সুনির্দিষ্ট বল প্রয়োগ হতে থাকে এবং সেই সময় বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট ত্বরণে নিচে পড়তে থাকে। একটা ঢালু তলে কোনো কিছু গড়িয়ে পড়তে দিয়েও আমরা এই বলকে ব্যবহার করতে পারি। কতটুকু ঢালু হবে, সেটা বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা বলটাকেও বাড়াতে কিংবা কমাতে পারি।

পৃথিবী পৃষ্ঠে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে আমরা তার সব কিছুই একটি ওজন আছে বলে অনুভব করি, ওজনটি আসলে সেই বস্তুর উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু যে পৃথিবী তার উপরে থাকা সব বস্তুকে নিজের

দিকে আকর্ষণ করে তা নয়, ভর আছে এরকম সকল বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে এই বলে আকর্ষণ করে। পৃথিবী যখন কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করে তখন সেই বলটিকে আমরা মাধ্যাকর্ষণ বল বলি, কিন্তু যখন মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি একে অন্যকে আকর্ষণ করে তখন এই একই বলকে আমরা মহাকর্ষ বল বলি।

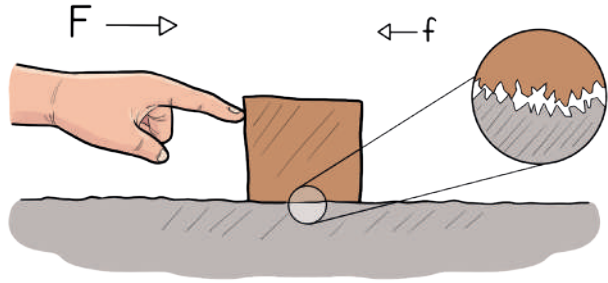
মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়াও আমরা আমাদের চারপাশের নানা ধরনের বল দেখতে পাই। তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ, আমরা যখন কোনো কিছুকে ধাক্কা দেই কিংবা কোনো কিছুকে টানি তখন আমরা আসলে বল প্রয়োগ করি। একটা স্প্রিংয়ের মাঝে কিছু ঝুলিয়ে দিলে স্প্রিংটি একটা বলে বস্তুটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তোমরা নিশ্চয়ই কখনও না কখনও চুম্বক ব্যবহার করেছ। চুম্বক লোহাকে একটা বল দিয়ে আকর্ষণ করে। শুধু আকর্ষণ নয়, একটা চুম্বক দিয়ে অন্য একটা চুম্বকের সমমেরুকে বিকর্ষণও করা যায়। তোমরা শীতের দিনে চিরুনি দিয়ে চুল আঁড়ানোর পর সেই চিরুনি দিয়ে কাগজের টুকরাকে একধরনের বলে আকর্ষণ করতে দেখেছ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই না এরকম কয়েক ধরনের বলও প্রকৃতিতে কাজ করে, বড় হয়ে সেগুলো সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে।

৯.১.১ ঘর্ষণ বল (friction force)

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে যদি ঘর্ষণের জন্য একটা বস্তুর গতিবেগ কমে না যেত, তাহলে সেটি অনন্তকাল চলতে থাকত। সে কারণেই তোমাদের অনেকের ধারণা হতে পারে, ঘর্ষণের ব্যাপারটাও বুঝি একধরনের ক্ষতিকর বল। কিন্তু সেটি পুরোপুরি সত্যি নয়। আমাদের জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ঘর্ষণ বল কমানোর চেষ্টা করি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বল বাড়ানোর চেষ্টা করি। সেই বিষয়গুলো দেখার আগে আমরা ঘর্ষণ বল কোথা থেকে আসে সেটি এককথায় বুঝে নিই।

তুমি যদি খুবই মসৃণ টেবিলে একটা কাঠের টুকরাকে রেখে সেটাকে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঠেলে দাও, তাহলে সেই টুকরার উপরে ডান থেকে বাম দিকে পাল্টা একটা বল কাজ করবে, যেটা তোমার দেওয়া বলটিকে কমিয়ে দেবে। তুমি যদি কাঠের টুকরাটিকে ডান দিক থেকে বাম দিকে ঠেলে দাও, তাহলে কাঠের টুকরাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে কাজ করে তোমার দেওয়া বলটিকে কমিয়ে দেবে। অর্থাৎ তুমি যেদিক থেকেই বল প্রয়োগ করো এটি সবসময় তার বিপরীত দিক থেকে কাজ করে

বলটিকে কমিয়ে দেবে। এটাই হচ্ছে ঘর্ষণ বল।



ছবি: অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে মসৃণ একটি তলকেও এবড়ো খেবড়ো মনে হয়।

কেন ঘর্ষণ বল এভাবে কাজ করে সেটা বোঝার জন্য কাঠের টুকরাটি যেখানে টেবিলকে স্পর্শ করেছে সেই অংশটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বহুগুণে বড় করে দেখলে তুমি দেখতে পাবে, কাঠের যে টুকরা বা টেবিলের যে অংশটাকে মসৃণ ভেবে এসেছ, সেটি আসলে মোটেও মসৃণ নয়। সেই অংশগুলো এবড়ো-খেবড়ো এবং সেখানে অসংখ্য উঁচুনিচু খাঁজ রয়েছে। কাজেই যখন একটা খাঁজকাটা এবড়ো-খেবড়ো অংশ একই ধরনের অন্য অংশের ওপর বসে তখন একটি খাঁজ অন্য খাঁজের ভেতরে ঢুকে যায়। যখন ধাক্কা দেওয়া হয়, তখন এই ক্ষুদ্র অংশগুলো ভেঙেচুরে নিয়ে যেতে হয়। খুবই স্বাভাবিকভাবে আমরা তখন এক ধরনের বাধার সম্মুখীন হই, যে বাধাটিকে আমরা ঘর্ষণ বল বলে থাকি। যদি কাঠের ওপরে ভারি কিছু রেখে চাপ দেওয়া হয় তাহলে ঘর্ষণ বলের পরিমাণ বেড়ে যায়। কারণ, যত চাপ দেওয়া হবে উপরের অংশের এবড়ো-খেবড়ো এবং খাঁজগুলো নিচের এবড়ো-খেবড়ো অংশ এবং খাঁজের ভেতর তত গভীরভাবে ঢুকে গিয়ে ঘর্ষণ বল তত বাড়িয়ে দেবে।

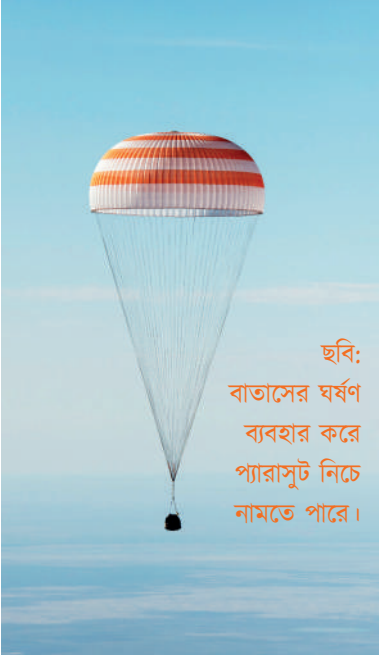
যখন ঘর্ষণ কমাতে চাই

অনেক সময়ই আমরা ঘর্ষণ বল কমাতে চাই। ঘর্ষণের কারণে তাপ সৃষ্টি হয়—শীতকালে আমরা হাত ঘষে গরম করে থাকি। গাড়ির ইঞ্জিনে সিলিন্ডারের ভেতরে পিস্টন ওঠানামা করে সেটি তার চাকাকে ঘোরায়। পিস্টন ওঠানামা করার সময়ে তার ঘর্ষণের জন্য তাপ সৃষ্টি হয়—তাপ সৃষ্টি হওয়ার অর্থ শক্তি নষ্ট হওয়া। তা ছাড়া তাপটুকু সরাতে না পারলে গাড়ির ইঞ্জিন উত্তপ্ত হয়ে যায়, সে জন্য সেখানে ঘর্ষণ কমাতে হয়। গাড়ি কিংবা বিমান সব সময় এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন বাতাসের ঘর্ষণ কম থাকে। সমুদ্রে জাহাজ কিংবা সমুদ্রের তলদেশের সাবমেরিনেও পানির সঙ্গে ঘর্ষণ কমানোর চেষ্টা করা হয়। নিচে ঘর্ষণ কমানোর কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা হলো:



ছবি: বল বিয়ারিং দিয়ে ঘর্ষণ অনেক কমানো যায়।

১. মসৃণ পৃষ্ঠে ঘর্ষণ কম হয় তাই যে পৃষ্ঠদেশে ঘর্ষণ হয়, সেটাকে মসৃণ করার চেষ্টা করা হয়।
২. ঘর্ষণরত দুটি তলের মধ্যে তেল, মবিল বা গ্রিজ জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঘর্ষণ কমানো যায়।
৩. চাকা যেহেতু ছোট এক জায়গায় স্পর্শ করে, তাই চাকা ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যায়।
৪. ঘুরন্ত চাকায় বল-বিয়ারিং ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যায়।



ছবি:
বাতাসের ঘর্ষণ
ব্যবহার করে
প্যারাসুট নিচে
নামতে পারে।

যখন ঘর্ষণ বাড়াতে চাই

আমরা অনেক সময়ই ঘর্ষণ বাড়াতে চাই। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, ঘর্ষণ না থাকলে আমরা হাঁটতে পারতাম না, হাঁটার চেষ্টা করলে পিছলে পড়ে যেতাম। আমরা গাড়ির চাকার সঙ্গে রাস্তার ঘর্ষণ বাড়াতে চাই যেন গাড়িগুলো দৃঢ়ভাবে রাস্তা আঁকড়ে থেকে দ্রুত যেতে পারে। বাতাসের ঘর্ষণ ব্যবহার করে আমরা প্যারাসুট দিয়ে নিরাপদে নিচে নামতে পারি। নিচে ঘর্ষণ বাড়ানোর কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা হলো:

১. যে দুটি তলে ঘর্ষণ হয়, সেই দুটি তলকে আরও খসখসে করা।
২. যে দুটি তলে ঘর্ষণ হয়, সেই দুটো তল জোরে চেপে ধরা।
৩. ঘর্ষণরত তলের মাঝে খাঁজ কাটা—জুতার তলা কিংবা গাড়ির চাকায় যেটা করা হয়।
- ৪। ঘর্ষণরত তল দুটি স্থির থাকলে ঘর্ষণ বেশি হয় বলে সেগুলোকে স্থির রাখার ব্যবস্থা করা।

৯.২ সরল যন্ত্র

তোমরা কি জানো ২০১৫ সালে বাংলাদেশে যে বিল্ডিং কোড সরকারিভাবে পাস করা হয়েছে, সেই কোড অনুযায়ী সব বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথে একটি হেলানো তল (ramp) বসানো বাধ্যতামূলক, যেন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী যে কোনো মানুষ কারও সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে বিল্ডিংয়ের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। হেলানো তল এক ধরনের সরল যন্ত্র, এটি ব্যবহার করে এক ধরনের ‘যান্ত্রিক সুবিধা’ পাওয়া যায়।

একটি ভারি বস্তু বা হুইলচেয়ারকে উপরে তোলা খুব সহজ নয়। কিন্তু যদি একটি হেলানো তল বা ramp ব্যবহার করা হয়, তাহলে বেশ সহজেই একটি হুইলচেয়ার বা অন্য ভারি বস্তুকে উপরে তোলা যায়, বা আমরা বলতে পারি একধরনের যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।

সরল যন্ত্র বলতে আমরা এই ধরনের যন্ত্রকে বোঝাই যার গঠন খুবই সহজ এবং যেটা ব্যবহার করে ব্যবহারের সুবিধার জন্য প্রয়োগ করা বলকে বৃদ্ধি করতে পারি বা বল প্রয়োগের দিক পরিবর্তন করতে পারি। সরল যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধাটুকুকে আমরা যান্ত্রিক সুবিধা বলে থাকি।

আমাদের চারপাশে যে সরল যন্ত্র রয়েছে আমরা সেগুলো কে ৬টি ভাগে ভাগ করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে:

৯.২.১ নিজার

তোমরা নিশ্চয়ই পার্কে ছেলেমেয়েদের উপর-নিচ করে খেলায় কাঠের তক্তার তৈরি সি-স (see-saw) দেখেছ। এটি দুই পাশে মুক্তভাবে নড়ার জন্য মাঝখানে একটু উচু করে বসানো হয়, তখন দুই পাশে দুজন সমান ওজনের শিশু উঠে সেটাকে নিজেদের ইচ্ছামতো উপর-নিচ করতে পারে। যদি এটির এক মাথায় একটি শিশু কিন্তু অন্য মাথায় শিশুটির থেকে অনেক বেশি ওজনের একজন বড় মানুষ বসে যায়, তাহলে শিশুটি সেটাকে আর ইচ্ছামতো উপর-নিচে করতে পারে না।

সি-স মাঝখানে যেখানে বসানো থাকে, সেটার নাম ফালক্রম। শিশুটিকে তার জায়গাতে বসিয়ে রেখেই বড় মানুষটিকে যদি ফালক্রমের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তাহলে কিন্তু শিশুটি খুব সহজেই তার থেকে অনেক বেশি ওজনের একজন বড় মানুষকে উপর-নিচে করতে পারবে। তার কারণ, ফালক্রমের অবস্থান দিয়ে লিভারের একধরনের যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।

লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা একটি সহজ সূত্র দিয়ে বের করা যায়। ছবিতে দেখানো উপায়ে ফালক্রমের দুই পাশের দূরত্ব যদি x এবং y হয়, তাহলে y দূরত্বটি x থেকে যতগুণ বেশি হবে, ছোট f বল প্রয়োগ করে ততগুণ বেশি বড় F বলকে সামাল দেওয়া যাবে।

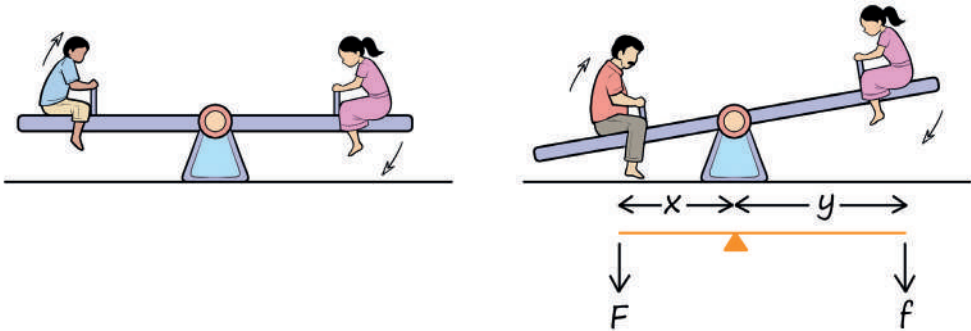
অর্থাৎ

$$\frac{y}{x} = \frac{F}{f}$$

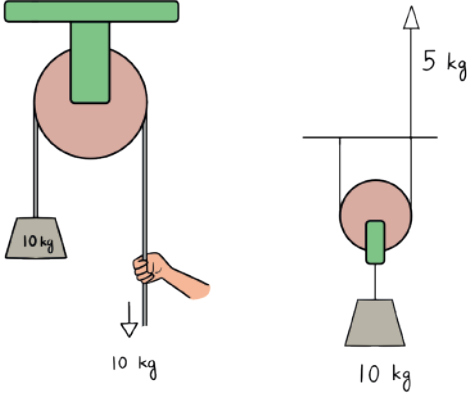
যান্ত্রিক সুবিধা:

$$\frac{F}{f} = \frac{y}{x}$$

লিভারের এই যান্ত্রিক সুবিধার বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস বলেছিলেন, "আমাকে মহাকাশে একটা দাঁড়ানোর জায়গা করে দাও, আমি পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে দেবো!"



ছবি: বাম দিকে সি-সয়ের দুই পাশে দুইজন সমান ওজনের শিশু। ডান পাশের ছবিতে ফালক্রমের কাছে থাকায় বেশি ওজনের বড় মানুষকে যান্ত্রিক সুবিধা ব্যবহার করে উপরে তুলতে পারে ছোট একজন শিশু!



ছবি: বাম পাশের ছবিতে বল প্রয়োগের দিক পরিবর্তিত করা হয়েছে। ডান পাশের ছবিতে কম বল প্রয়োগ করে বেশি ওজনের বস্তুকে উপরে তোলা হচ্ছে।

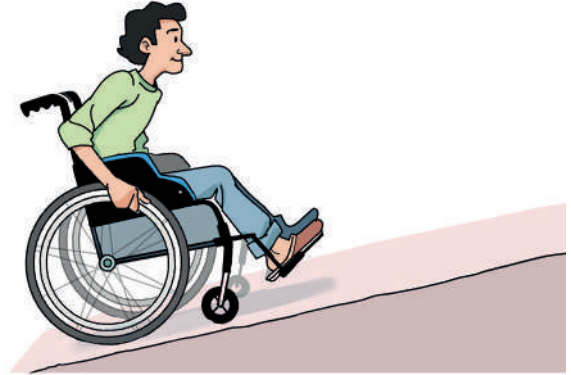
৯.২.২ কপিকল

তোমাদের স্কুলের জাতীয় পতাকা তোলার সময় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, তোমাদের শিক্ষক একটি দড়িকে নিচের দিকে টানছেন, তখন অন্যদিকে পতাকাটি উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। কারণ, পতাকাকে বাঁধা দড়িটি একটি কপিকলের ভেতর দিয়ে ঘুরে এসেছে। পাশের ছবিতে তোমাদের দুটি কপিকলের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। প্রথম ছবিতে কপিকলের এক পাশে একটি ১০ কেজি ওজন আছে। অন্য পাশ থেকে একজন দড়ি দিয়ে ওজনটিকে টেনে উপরে তুলছে। এখানে যখন দড়িটি টেনে নামানো হচ্ছে, তখন ওজনটি উপরে উঠে যাচ্ছে। এখানে আমরা বল প্রয়োগের দিক পরিবর্তন করে ফেলেছি, নিচের দিকে বলপ্রয়োগ করে ওজনটিকে উপরে তুলে ফেলেছি—এটি একধরনের যান্ত্রিক সুবিধা হতে পারে।

দ্বিতীয় ছবিতে ওজনটি ঝোলানো আছে কপিকল থেকে, কিন্তু সেটি কোথাও লাগানো নেই বলে মুক্তভাবে নড়তে পারে। এখানে ওজনটিকে উপরে তুলতে হলে আমাদের দড়িটিকে উপরে টানতে হবে। দড়িটি টেনে যতটুকু উপরে তোলা হবে ওজনটি তার অর্ধেক দূরত্ব উপরে উঠবে। সে জন্য আমরা একটি যান্ত্রিক সুবিধা পাব—ওজনটিকে অর্ধেক বল প্রয়োগ করে উপরে তুলে ফেলতে পারব।

৯.২.৬ হেলানো তল

এই অধ্যায়ের শুরুতে হুইলচেয়ারে বিন্দিংয়ের ঢোকানোর জন্য হেলানো তল নামে সরল যন্ত্রের কথা ইতোমধ্যে তোমাদের বলা হয়েছে। তোমরা নিজেরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, একটা খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য; কিন্তু যদি তলটির ঢাল অনেক কম হয়, সেটা দিয়ে উপরে ওঠা তুলনামূলকভাবে সহজ। কাজেই একটা যান্ত্রিক সুবিধা বের করার জন্য কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে কতটুকু উচ্চতায় ওঠা যায়, তার তুলনা বের করতে হয়।

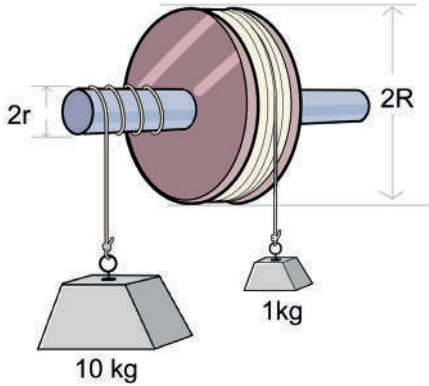


ছবি: হেলানো তল ব্যবহার করে একজন খুব সহজেই হুইল চেয়ারে উপরে উঠে যেতে পারে।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{অতিক্রান্ত উচ্চতা}}$$

একটি হুইল চেয়ার ওঠানোর জন্য যান্ত্রিক সুবিধা কমপক্ষে ১২ হওয়া প্রয়োজন।

৯.২.৪ চাকা এবং অক্ষ



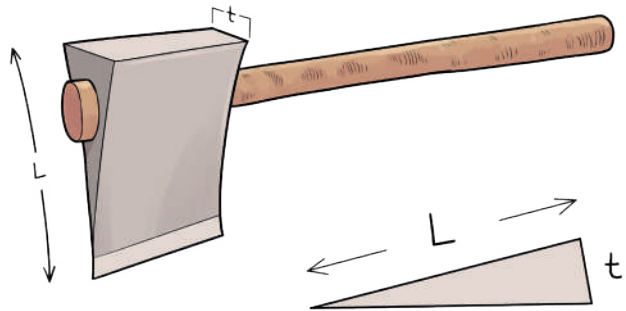
ছবি: সরু অক্ষের উপর ঝুলানো ভারী ওজন বড় চাকার উপর ঝুলানো কম ওজন দিয়ে উপরে তোলা সম্ভব।

আমরা সবাই জানি যে যেকোনো চাকা একটা অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরে। যদি একটা চাকার ব্যাসার্ধ বড় হয় এবং তার তুলনায় অক্ষের ব্যাসার্ধ ছোট হয়, তাহলে এই অক্ষ-চাকার সমন্বয়টি একটা সরল যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কল্পনা করে নাও একটা বড় চাকা এবং তার অক্ষদণ্ড দুটিতেই এমনভাবে দড়ি প্যাঁচানো আছে যে বড় চাকার দড়ি টেনে সেটাকে ঘোরালে অক্ষদণ্ডটি ঘুরতে থাকে এবং সেখানে অন্য একটা দড়ি প্যাঁচাতে থাকে। এখন তুমি যদি অক্ষদণ্ডে একটা ভারি ওজন বেঁধে দাও তাহলে দেখবে বড় চাকাটিকে দড়ি টেনে ঘুরিয়ে তুমি সহজেই সেটাকে টেনে তুলতে পারবে। যদি বড় চাকার ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের দশ গুণ হয় তাহলে তুমি ১০ কেজি ওজনকে ১ কেজির সমান বলপ্রয়োগ করে টেনে তুলতে পারবে। অর্থাৎ যান্ত্রিক সুবিধা হচ্ছে:

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{বড় চাকার ব্যাসার্ধ}}{\text{অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধ}}$$

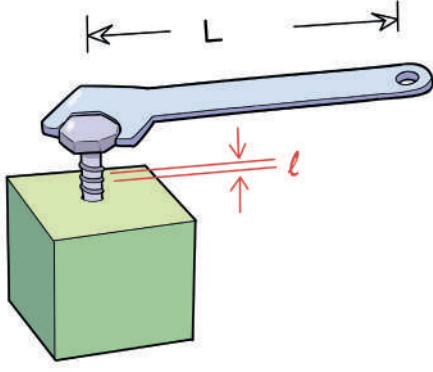
৯.২.৫ ফাল বা wedge

তোমরা নিশ্চয়ই কুড়াল দেখেছ। তোমরা কি কখনো কুড়ালের ফলাটি লক্ষ্য করেছ? যদি করে থাকো, তাহলে দেখবে কুড়ালের ফলার মাথাটি সরু এবং ক্রমে সেটি চওড়া হয়ে গেছে। কুড়ালের ফলার এই বিশেষ আকার হওয়ার কারণে এটি ব্যবহার করলে একটি যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। কাঠ কাটার সময় কুড়াল দিয়ে আঘাত করলে তুমি যত বলে আঘাত করবে, কুড়ালের ফলাটি তার থেকে বেশি বলে কাঠের ভেতরে ঢুকে যাবে। ফলার দৈর্ঘ্য যদি L এবং ফলাটি যদি t পুরু হয় তাহলে তার যান্ত্রিক সুবিধা হচ্ছে:



ছবি: কুড়ালের ফলা ফাল বা wedge এর উদাহরণ।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ফলার দৈর্ঘ্য}}{\text{ফলার পুরুত্ব}} = \frac{L}{t}$$



ছবি: একটি রেঞ্চের দৈর্ঘ্য যত বড় হবে তত বেশি যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

৯.২.৬ স্ক্রু

দৈনন্দিন কাজে আমাদের সবাইকেই কখনো না কখনো স্ক্রু ব্যবহার করতে হয়। একটা স্ক্রুর মাঝে খাঁজকাটা থাকে এবং সেটাকে ঘুরিয়ে একটা কঠিন বস্তুর মাঝে ঢোকানো যায়। স্ক্রুর মাথায় একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ঘুরিয়ে সেটাকে গর্তে ঢোকানো যায়। যদি স্ক্রু ড্রাইভারের গোড়ায় কোনোভাবে একটা লম্বা দণ্ড লাগিয়ে স্ক্রুটাকে ঘোরানো যেত, তাহলে সেটাকে আরও সহজে সেটির গর্তে ঢোকানো যেত। অর্থাৎ এখানে যান্ত্রিক সুবিধা পেতে হলে একটা দীর্ঘ দণ্ড লাগিয়ে নিয়ে সেটাতে ঘোরাতে হবে, রেঞ্চ যেভাবে সেটা করা হয়। তোমরা লক্ষ করে থাকবে একটা গাড়ির চাকার বোল্ট খোলার সময় রেঞ্চটাকে প্রয়োজনে একটা

পাইপ ঢুকিয়ে লম্বা করে নেওয়া হয়। এখানে যান্ত্রিক সুবিধাটুকু রেঞ্চের দৈর্ঘ্য (L) এবং দুটো খাঁজের মাঝখানের দূরত্বের (l) ওপরে নির্ভর করে।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{রেঞ্চের দৈর্ঘ্য}}{\text{দুটো খাঁজের মাঝখানের দূরত্ব}} = \frac{L}{l}$$

সন্ধাননী ?

প্রশ্ন: নিচে নানা ধরনের যন্ত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে, কোনটি কোন ধরনের সরল যন্ত্র বলতে পারবে?



৯.৩ শক্তি (energy)

আমরা সবাই শক্তি শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। কোনো কিছুই ক্ষমতা অনেক বেশি হলে আমরা সেটাকে শক্তিশালী কিংবা বলশালী বলি। তোমরা কি জানো বিজ্ঞানের ভাষায় কিন্তু শক্তি এবং বল কথা দুটির সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে এবং শক্তি এবং বল সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে থাকে।

বল বলতে কী বোঝায় তোমরা সেটা এর মধ্যে জেনে গেছ, যেটি গতি পরিবর্তন করতে পারে সেটা হচ্ছে বল, আর যেটা কোনো ধরনের ‘কাজ করতে পারে’ সেটা হচ্ছে শক্তি। এখানে কাজ বলতে বল প্রয়োগ করে কোনো কিছুকে নাড়ানো বোঝানো হয়। উপরের ক্লাসে উঠে তোমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

৯.৩.১ গতিশক্তি

পৃথিবীতে নানা ধরনের শক্তি আছে। যেমন তাপ এক ধরনের শক্তি, আলো এক ধরনের শক্তি, বিদ্যুৎ এক ধরনের শক্তি, শব্দ এক ধরনের শক্তি। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে পরিচিত শক্তি হচ্ছে গতিশক্তি। যে কোনো বস্তুকে গতিশীল করলেই তার ভেতরে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়, সেই শক্তিটার নাম হচ্ছে গতিশক্তি। তোমরা নিশ্চয়ই বিষয়টা নানাভাবে অনুভব করেছ, একটা ইটের ওপর একটা হাতুড়ি রাখলে কিছুই হয় না, কিন্তু তুমি যদি হাতুড়িটাকে প্রচণ্ড বেগে ইটের ওপর আঘাত করো, ইটটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তার কারণ গতিশক্তির কারণে হাতুড়িটার মধ্যে একটা শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। একটা বস্তুর ভর যদি m হয় আর সেটা যদি v বেগে যায়, তাহলে তার গতিশক্তি হবে:

$$\text{গতিশক্তি} = \frac{1}{2} m(v \times v)$$

একটি গাড়ি যদি ঘণ্টায় 40 কিলোমিটার বেগে যায় তাহলে তার একটা গতিশক্তি থাকবে। গাড়িটার গতিবেগ যদি দ্বিগুণ করে ফেলা যায়, তাহলে তার শক্তি কিন্তু দ্বিগুণ বাড়বে না, সেটি বাড়বে চার গুণ। এ জন্য গাড়ি দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির একটা বড় কারণ গতিবেগ। একটা গাড়ি যখনই বেশি গতিতে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনায় পড়ে তখন ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেক বেশি।



ছবি: দুর্ঘটনার শিকার একটি গাড়ির ভাঙ্গুর

৯.৩.২ শক্তির রূপান্তর

শক্তির কিন্তু ধ্বংস নেই, আবার সৃষ্টিও নেই, এটির শুধু রূপান্তর আছে। কাজেই যদি একটা গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে গতিশীল হয়, তাহলে তার মধ্যে যে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো শক্তি থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। তুমি কি বলতে পারবে সেই শক্তিটি কোথা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে?

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে সেই শক্তিটি সৃষ্টি করেছে গাড়ির ইঞ্জিন এবং সেটি সৃষ্টি করার জন্য ইঞ্জিন ব্যবহার করেছে গাড়ির জ্বালানি—পেট্রোল, ডিজেল অথবা গ্যাস। এই জ্বালানিতে যে শক্তি সঞ্চিত

আছে আমরা সেটাকে বলি রাসায়নিক শক্তি। এই রাসায়নিক শক্তিটাও এসেছে বহু লক্ষ বছরে পৃথিবীর তাপ এবং চাপ থেকে।

রাসায়নিক শক্তি আমাদের পরিচিত শক্তি। আমাদের টেলিফোনের ব্যাটারির মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে, ব্যবহারের সময় সেটা বৈদ্যুতিক শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। যখন সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি কমে আসে, তখন ব্যাটারি চার্জ করার সময় আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহ করিয়ে বিদ্যুৎশক্তিকে আবার রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা করে রাখতে পারি।

আমরা যখন ঘরে বাতি জ্বালাই তখন বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলোতে রূপান্তর করি, যখন হিটার ব্যবহার করি তখন তাপে রূপান্তর করি, যখন লাউডস্পিকারে গান শুনি তখন সেটাকে শব্দে রূপান্তরিত করি, যখন ফ্যান চালাই তখন তাকে গতিশক্তিতে রূপান্তর করি। কাজেই তোমরা একটু চিন্তা করলেই দেখবে শক্তির জন্ম নেই কিংবা ধ্বংস নেই; কিন্তু এটি শুধু একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়।

৯.৩.৩ স্থিতিশক্তি

একটা ব্যাটারির ভেতর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা রাখা যায় এবং প্রয়োজনে সেটাকে ব্যবহার করা যায়। আমরা চাইলে অন্যভাবেও এভাবে শক্তি জমা করতে পারি। একটা ছোট পাথরের টুকরা মেঝের ওপরে থাকলে সেটার ভেতরে কোনো শক্তি নেই কিন্তু যদি পাথরের টুকরাটাকে তুলে একটা টেবিলের ওপর রাখা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাথরের টুকরোর মধ্যে এক ধরনের স্থিতিশক্তি জমা হয়ে যাবে। কারণ, আমরা যদি টোকা দিয়ে পাথরের টুকরাটিকে টেবিল থেকে নিচে ফেলে দিই, তাহলে নিচে পড়ার সময় সেটির ভেতরে গতি সৃষ্টি হবে—যত বেশি নিচে পড়বে, তত বেশি গতিশীল হবে। আমরা এখন জানি, গতি থাকলেই গতিশক্তি থাকে, কাজেই পাথরের টুকরাটির মধ্যে গতিশক্তি সৃষ্টি হবে। এই গতিশক্তি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয়েছে পাথরের টুকরাটি টেবিলের উপরে তোলার কারণে।

স্থিতিশক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। যেখানে নদী অথবা হ্রদে বাঁধ দিয়ে পানি জমা করে রাখা হয়, তারপর অনেক উচ্চতা থেকে সেই পানি নিচে নামিয়ে এনে সেই শক্তিকে ব্যবহার করে সেটা দিয়ে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়।



৯.৩.৪ শক্তির পরিমাপ

শক্তির এককের নাম জুল। প্রতি সেকেন্ডে এক জুল শক্তি ব্যয় করা হলে, সেটাকে বলে ওয়াট। তোমরা জুল এককটির নাম না শুনে থাকলেও নিশ্চয়ই ওয়াট শব্দটির নাম শুনেছ। যে কোনো ব্যবহারিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কিনলে তুমি দেখবে, সেখানে লেখা থাকে সেই যন্ত্রটির জন্য কত ওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হয়।

৯.৩.৫ শক্তির পরিবহন

আমরা যত ধরনের শক্তির সঙ্গে পরিচিত তার মধ্যে ব্যবহার করার জন্য সবচেয়ে সহজ শক্তিটির নাম হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে খুব সহজে লাইট জ্বালানো যায়, ফ্যান ঘোরানো যায়, ফ্রিজ চালানো যায়, কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়। সে কারণে শহরে গ্রামে এমনকি দুর্গম অঞ্চলেও আমাদের সবার বাসায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। সে জন্য বিদ্যুৎকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হয় এবং সেটাকে সকল বাসা, কলকারখানা, অফিস বা স্কুল এবং কলেজে ছড়িয়ে দিতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, বিদ্যুতের লাইন দিয়ে খুব যত্ন করে এবং সতর্কভাবে সব জায়গায় বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয়। আমরা গ্যাসকেও পাইপ দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরবরাহ করি এবং বিতরণ করি। গ্যাস সরাসরি শক্তি না হলেও এটার সঞ্চিত শক্তি থেকে তাপ সৃষ্টি হয়, সেই তাপ দিয়ে অন্য শক্তি সৃষ্টি করা হয়।



ছবি: বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চালন করা হয় হাই ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক লাইন দিয়ে।

৯.৪ ঐতিহাসের সবচেয়ে চমকপ্রদ সূত্র

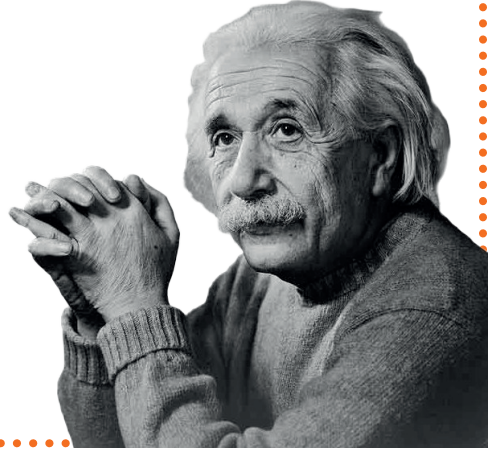
ইতিহাসের সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং সবচেয়ে বিখ্যাত সূত্রটি শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন শক্তির এই সূত্রটি দিয়েছেন। এই সূত্র অনুযায়ী বস্তুর ভর ও শক্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। যদি বস্তুর ভর m হয় এবং আলোর গতি c হয়, তাহলে এই ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করলে শক্তির পরিমাণ E হবে:

$$E = m(c \times c)$$

আলোর বেগ যেহেতু অনেক বেশি, তাই ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা হলে সেটি অচিস্তনীয় পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি করে। সূত্রটি লেখার সময় $c \times c$ না লিখে সহজ করে c^2 লেখা হয়, অর্থাৎ প্রকৃত জগদ্বিখ্যাত সূত্রটির রূপ হচ্ছে এরকম:

$$E = mc^2$$

নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে এভাবে শক্তি তৈরি করা হয়। সূর্য যদি সাধারণ জ্বালানি দিয়ে শক্তি তৈরি করত, তাহলে অনেক আগেই সূর্যের সব জ্বালানি শেষ হয়ে এটি নিভে যেত, কিন্তু সূর্যের মধ্যেও $E = mc^2$ প্রক্রিয়ায় শক্তি তৈরি হয় বলে এটি ৫ বিলিয়ন বছর ধরে শক্তি দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও ৫ বিলিয়ন বছর শক্তি দিয়ে যাবে!



স্নুশীলনী ?

- ১। স্পর্শ না করে বল প্রয়োগ করা সম্ভব এরকম কয়েকটি বলের উদাহরণ দাও।
- ২। পৃথিবীতে যদি ঘর্ষণ বল না থাকতো তাহলে তোমার দৈনন্দিন জীবনটি কেমন হতো বর্ণনা করো।
- ৩। ১ কেজি ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে সেই শক্তি দিয়ে কতগুলো ১০০ ওয়াটের বাল্বকে ২৪ ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা যাবে?



ଅଧ୍ୟାୟ ୧୦
ମାନବ ଶରୀର

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ প্রাণিজগতে মানুষের শারীরবৃত্তীয় অবস্থান
- ☑ মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ
- ☑ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের গঠন ও কাজ
- ☑ শরীরের যত্ন ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

জীবাশ্ম বা ফসিল বনতে কী বোঝায়?



প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো জীবের শরীরের অংশ যখন মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়ে, বা অন্য কোনো উপায়ে বহু বছর ধরে সংরক্ষিত হয়, তখন তাকে বলে জীবাশ্ম বা ফসিল। প্রাচীন পৃথিবীর উদ্ভিদ বা প্রাণীদের সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় উৎসই হলো সেই সময়ের প্রাপ্ত জীবাশ্মের নমুনা। যেমন, আমরা তো সবাই ডাইনোসরের কথা জানি। এই বিশাল বিশাল প্রাণীরা একসময় পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত। ডাইনোসরের কালে তো আর মানুষ ছিল না, তাদের কেউ দেখেওনি! কিন্তু এই প্রাণীদের সম্পর্কে এখন এই যে এত কিছু জানা যায়, তার প্রধান উৎস কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়া ডাইনোসরের ফসিল বা জীবাশ্ম!

১০.১ মানব শরীর

আমরা যদি আমাদের চারপাশে তাকাই তবে নানান রকম জীব দেখতে পাব। যেমন গাছ, শালিক, কবুতর, মুরগী, হাঁস, মাছ, বিড়াল, কুকুর, ছাগল, গরু ইত্যাদি। এগুলোর পাশাপাশি আরও যে জীবটি আমরা সবসময়েই দেখতে পাই, তা হচ্ছে মানুষ। মানুষও অন্য সকল জীবের মতোই জীবন ধারণ করে। সে চলাচল করতে পারে। তাই সে হচ্ছে প্রাণী।

ছোটবেলা থেকেই আমরা অবাক হয়ে ভাবি ‘কোথা থেকে এসেছি আমরা’, ভাবি ‘অন্য প্রাণীদের চেয়ে আমরা কীভাবে আলাদা’। অন্য সব জীবের যেমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আমাদেরও তেমন রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখতে অন্য প্রাণীদের চেয়ে ভিন্নতর, আমাদের হাঁটার ধরন, খাদ্যাভ্যাস, চিন্তার ক্ষমতা সবকিছুতেই রয়েছে অন্য প্রাণীদের তুলনায় আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। আধুনিক মানুষই (বৈজ্ঞানিক নাম Homo sapiens) একমাত্র প্রাণী যারা সোজা হয়ে দুই পায়ে চলাচল করতে পারে। তবে এই আধুনিক মানুষের আগেও মানুষের কিছু আদি প্রজাতি ছিল যারা কিন্তু এভাবে সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটতে পারত। বিবর্তন (evolution) বিষয়ে গবেষণা আমাদের সেটা বুঝতে সাহায্য করে।

আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে পাওয়া ফসিল

(fossil) বা জীবাশ্মগুলোর বিস্ময়কর উপস্থিতি এবং ক্রম-বিস্তৃতি থেকে আমরা আমাদের বিবর্তনকে বুঝতে পারি। জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে আমরা বুঝতে পারি কখন আমরা সোজা হয়ে হাঁটতে শুরু করেছি। আকারগত পরিবর্তনগুলো যেমন আমাদের শরীরের চওড়া নিতম্ব (পশ্চাৎভাগ), পায়ের বাকি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পায়ের বড় আঙুল এবং ছোট বাহু কখন পেয়েছি। বিবর্তনের ধারায় আমাদের মস্তিষ্কের আকারও বেড়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত গবেষণা তথ্য বলছে, প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের চেনাজানা প্রাণীদের ভেতর বানর, ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জি এরা মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে কাছাকাছি। মানুষসহ এসব প্রাণীদের বলা হয় প্রাইমেট (primate)।

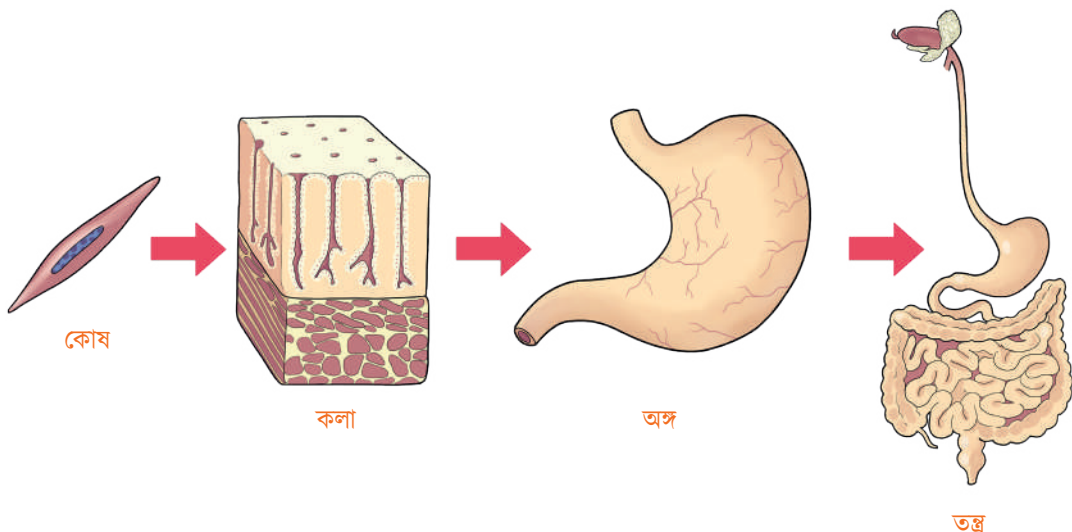
সকল প্রাইমেট জাতীয় প্রাণীদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। আর তা হচ্ছে এদের শরীরের মেরুদণ্ডের উপস্থিতি। আমাদের পিঠের মাঝ বরাবর যে খণ্ড খণ্ড হাড়ের উপস্থিতি আমরা হাত দিলেই অনুভব করতে পারি এটিই আমাদের মেরুদণ্ড, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় spine।

আমাদের শরীরের দিকে তাকালে আমরা চোখ, কান, নাক, মাথা, শরীরের ত্বক বা চামড়া, নখ ইত্যাদি দেখতে পাই। এছাড়া আমাদের শরীরের ভেতরে রয়েছে আমাদের হৃৎপিণ্ড (heart), যকৃৎ (liver), ফুসফুস (lungs), বৃক্ক (kidney), অগ্ন্যাশয় (pancreas) ইত্যাদি। এগুলো আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। আমাদের পরিচিত অন্যান্য প্রাণী, যেমন হাঁস, মুরগি, গরু এদেরও কিন্তু এসব অঙ্গ রয়েছে।

আমাদের নখ আমরা খালি চোখেই দেখতে পাই। হাত-পায়ের নখ বড় হলে আমরা কেটে ফেলি। এই নখকে যদি আমরা ক্রমাগত ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে থাকি, তবে একপর্যায়ে এসব টুকরোকে আর খালি চোখে দেখা যাবে না। তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এগুলো দেখতে হবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শেষ পর্যন্ত নখের কোষ দেখতে পাব। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি কোষ হচ্ছে আমাদের গঠন ও কাজের একক। মানুষের মতো জটিল গঠনের জীবের জন্য কোটি কোটি কোষ দরকার। এসব কোষ একে অপরের সঙ্গে মিলে শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো মানুষের গঠন তৈরি করে।

আণুবীক্ষণিক কোষ থেকে শুরু করে খালি চোখে দেখতে পাওয়া মানব শরীরের এই গঠনের বিষয়গুলো বিজ্ঞানীরা নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে আলোচনা করেন।

কোষ (cell) > টিস্যু বা কলা (tissue) > অঙ্গ (organ) > তন্ত্র (system)



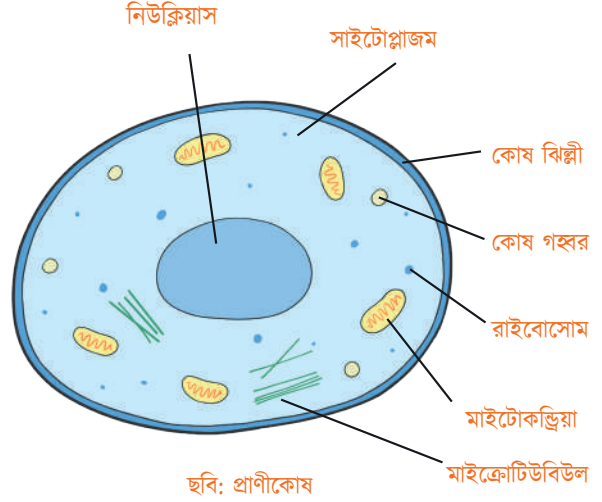
তোমরা একটু পরেই দেখবে, কোষ হচ্ছে গঠনের এই ধাপের সবচেয়ে নিচের কিংবা বলা যেতে পারে সবচেয়ে সরল একক। আর তন্ত্র বা সিস্টেম হচ্ছে এই গঠনের সবচেয়ে ওপরের ধাপ।

আমরা নিচে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব।

১০.২ কোষ (cell)

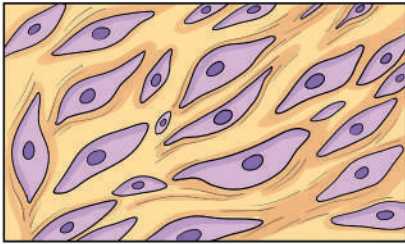
একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে মোট কত কোষ থাকে? এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভেতর অনেক দিনের প্রশ্ন ছিল। তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ এই সংখ্যা প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন (৩০০০০০০-৪০০০০০০ কোটি)। এই কোটি কোটি কোষ মানব শরীরের বৃদ্ধি, বিপাক, উদ্দীপনা এবং প্রজননে ভূমিকা রাখে।

প্রাণীকোষের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা সবই মানুষের কোষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

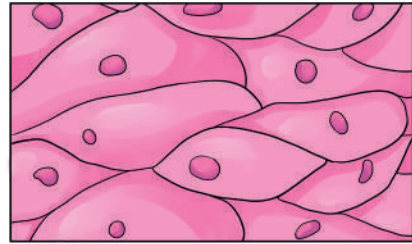


১০.৩ কলা বা টিস্যু (tissue)

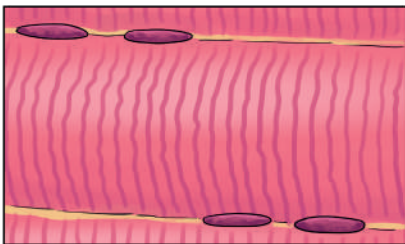
মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের কোষ রয়েছে। এদেরকে চারটি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই চার ধরনের কোষ, তাদের চারপাশের উপাদানের সঙ্গে মিলে যে বিশেষ গাঠনিক একক তৈরি করে এদেরকে বলা হয় টিস্যু বা কলা। চার শ্রেণির কোষের ওপর ভিত্তি করে মানব শরীরের টিস্যুগুলোকে চারটি ধরনে ভাগ করা যায়।



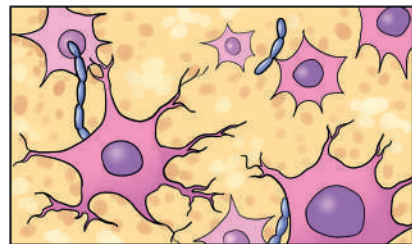
সংযোজক কলা



বহিরাবরণীয় কলা



পেশী কলা



নায়ুকলা

সংযোজক কলা বা কানেক্টিভ টিস্যু (connective tissue): এই টিস্যুগুলো দূরবর্তী কোষগুলোকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত করে এবং শরীরের কাঠামোকে একত্রিত করে। এদেরকে বলা হয় সংযোজক কলা বা কানেক্টিভ টিস্যু (connective tissue)।

বহিরাবরণীয় কলা বা এপিথেলিয়াল টিস্যু (epithelial tissue): এই ধরনের কলা বা টিস্যু আমাদের শরীরের বাইরের আবরণ এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ও শরীরের গহ্বরগুলোর বাইরের স্তরটিকে ঢেকে রাখে। এদেরকে বলা হয় বহিরাবরণীয় কলা বা এপিথেলিয়াল টিস্যু (epithelial tissue)।

পেশি কলা বা মাসল টিস্যু (muscle tissue): এ ধরনের টিস্যু সংকোচন ও প্রসারণ করতে সক্ষম এবং শরীরের পেশি গঠন করে। এদেরকে বলা হয় পেশি কলা বা মাসল টিস্যু (muscle tissue)।

স্নায়ুকলা বা নার্ভ টিস্যু (nerve tissue): এ ধরনের টিস্যু আমাদের শরীরের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্র তৈরি করে। এদেরকে বলা হয় স্নায়ুকলা বা নার্ভ টিস্যু (nerve tissue)।

১০.৪ অঙ্গ (organ)

উল্লিখিত চার ধরনের টিস্যু বা কলা মিলে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয়। এক একটি অঙ্গ হচ্ছে একাধিক টিস্যুর সমন্বয়ে তৈরি, যা একটি স্বতন্ত্র গাঠনিক এবং কার্যকরী একক তৈরি করে। মানব শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ আছে; যেমন: হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ফুসফুস, বৃক্ক ইত্যাদি। এসব অঙ্গ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানব শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হলো আমাদের ত্বক (skin)।

১০.৫ তন্ত্র (system)

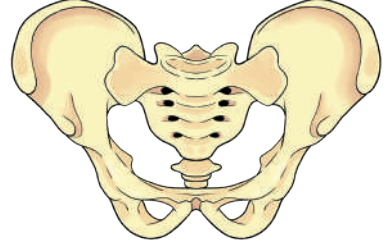
আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ আলাদা আলাদা বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। বরং এদের কোনো কোনোটি একসঙ্গে মিলে আমাদের শরীরে একই ধরনের কাজ করে। কাজের ভিত্তিতে এই অঙ্গগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিটি ভাগকে বলা হয় একটি সিস্টেম বা তন্ত্র। যেমন, আমাদের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে এমন একটি অঙ্গ, যার গঠনে উল্লিখিত চার ধরনের টিস্যুই অংশগ্রহণ করে। এই অঙ্গটির কাজ হচ্ছে, আমাদের সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনে ভূমিকা রাখা। তবে রক্ত সঞ্চালনের এই কাজটি হৃৎপিণ্ড একা করতে পারে না। এই কাজের জন্য এটিকে রক্তনালিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি সমন্বিত ব্যবস্থা বা সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করতে হয়। এই পুরো সিস্টেমকে বলা হয় রক্ত সংবহনতন্ত্র। এভাবে আমাদের শরীরের নানা অঙ্গ যোগুলোর নাম আমরা জানি; যেমন কিডনি, লিভার, ফুসফুস, চোখ, নাক এবং অন্য অঙ্গসমূহ—সেগুলোও নিজেদের কাজের জন্য অন্য অঙ্গ এবং টিস্যুর ওপর নির্ভর করে।

নিচে আমরা মানব শরীরের প্রধান তন্ত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব।

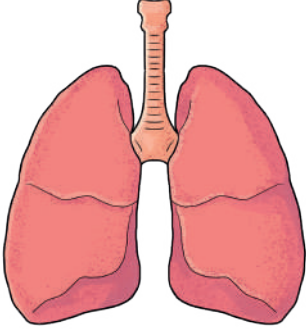
১. ত্বকতন্ত্র (integumentary system): অনেক সময় খেলতে গিয়ে বা ছোটখাটো দুর্ঘটনায় হাত-পায়ের চামড়া কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়। আমাদের পুরো শরীরের ওপরে এই যে চামড়া বা ত্বকের আবরণ, তা বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের শরীরের একটা আবরণ বা প্রতিরক্ষা দেওয়াল তৈরি করে এবং আমাদের শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। আমাদের শরীরের এই ত্বক দ্বারা গঠিত তন্ত্র হচ্ছে ত্বকতন্ত্র। ক্ষতিকর অণুজীব (microorganisms) এবং রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আক্রমণ থেকে ত্বকতন্ত্র শরীরকে রক্ষা করে।

২. পেশি ও কঙ্কালতন্ত্র (muscular and skeletal systems):

আমরা যখন হাঁটি তখন আমাদের শরীরের হাড় (bones) এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশি (muscle) আমাদের প্রয়োজনীয় সঞ্চালন শক্তি দেয়। আমাদের শরীরের হাড় বা কঙ্কাল (skeleton) এবং তার সাথে মাংসপেশি মিলে যে তন্ত্র তৈরি করে তাকে পেশি-কঙ্কালতন্ত্র বলে। একে অনেক সময় আলাদা করে পেশি এবং কঙ্কালতন্ত্র হিসেবে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়। মানুষের শরীরের কঙ্কালতন্ত্র প্রায় ২০৬টি হাড় নিয়ে



ছবি: হাড়



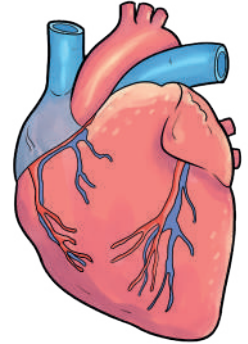
ছবি: ফুসফুস

গঠিত। পেশিতন্ত্র কঙ্কালতন্ত্রের সঙ্গে মিলে শরীরকে চলাচলে সাহায্য করে এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে।

৩. শ্বসনতন্ত্র (respiratory system): আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমাদের এই শ্বাস-প্রশ্বাসকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের ফুসফুস এবং তার সঙ্গে আরও কিছু অঙ্গ কাজ করছে। আমাদের শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ, ফুসফুস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় শ্বসনতন্ত্র। শ্বসনতন্ত্র বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বাতাসে ফিরিয়ে দেয়।

৪. সংবহনতন্ত্র / হৃদ-সংবহন তন্ত্র (vascular system):

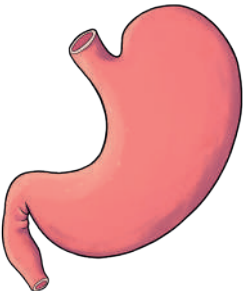
আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের ভেতর যোগাযোগের জন্য রক্তের মাধ্যমে তৈরি হওয়া একটি কার্যকর পরিবহনব্যবস্থা আছে। হৃৎপিণ্ড শরীরের রক্ত সঞ্চালন করে, রক্তনালির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও কোষে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ করে এবং সেসব জায়গায় সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ পরিবহন করে। এই হৃৎপিণ্ড, রক্ত এবং রক্তনালিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় সংবহনতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া, বর্জ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি জ্বর না হলে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা সব সময় যে একই থাকে তা নিয়ন্ত্রণ করে এই সংবহনতন্ত্র।



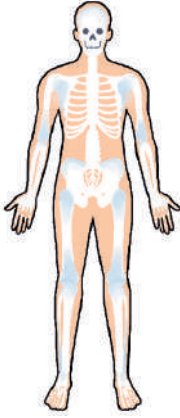
ছবি: হৃৎপিণ্ড

৫. পরিপাক/পাচনতন্ত্র (digestive system):

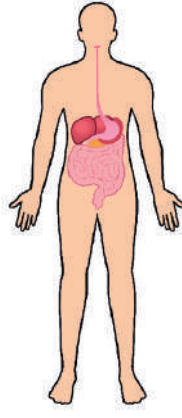
আমরা সবাই ক্ষুধা পেলে খাবার খাই। এই খাবার কিন্তু সরাসরি আমাদের শরীরে কাজে লাগে না। খাবার থেকে শক্তি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে শরীরের কাজের জন্য উপযোগী করে আমাদের পরিপাকতন্ত্র। মুখ, খাদ্যনালি, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিপাক/পাচনতন্ত্র। এই তন্ত্র আমাদের গ্রহণ করা খাদ্যকে ব্যবহারযোগ্য পুষ্টি উপাদানে ভেঙে দেয়, যা পরে আমাদের শরীরে শোষিত হয়। এই তন্ত্রের শেষ অংশ হচ্ছে পায়ু বা মলদ্বার, যা আমাদের খাবারের অব্যবহারযোগ্য বা বর্জ্য অংশকে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার পথ হিসেবে কাজ করে।



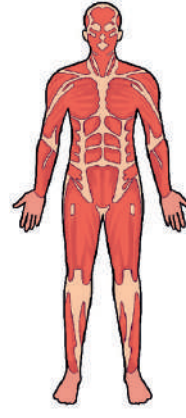
ছবি: পাকস্থলি



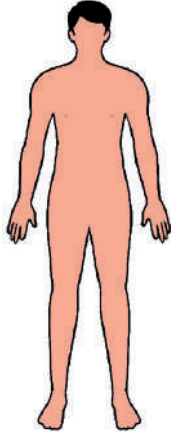
কঙ্কালতন্ত্র



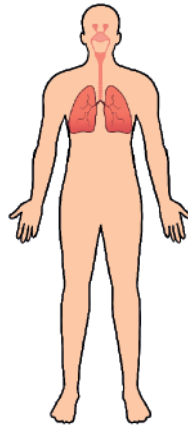
পরিপাকতন্ত্র



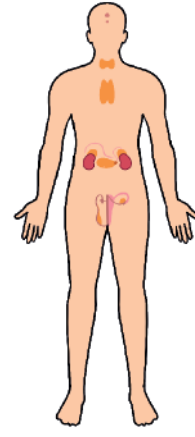
পেশিতন্ত্র



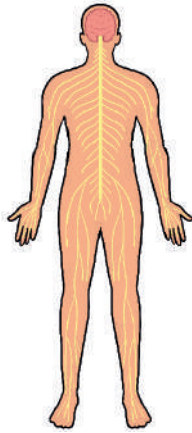
ত্বকতন্ত্র



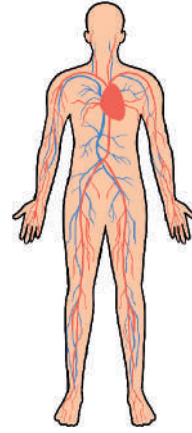
শ্বসনতন্ত্র



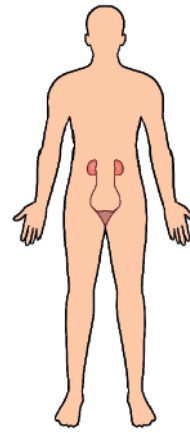
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র



স্নায়ুতন্ত্র



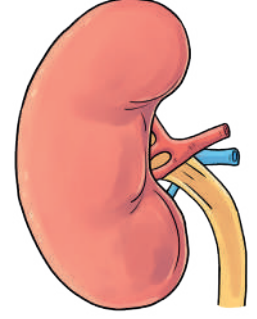
সংবহনতন্ত্র



রেচনতন্ত্র

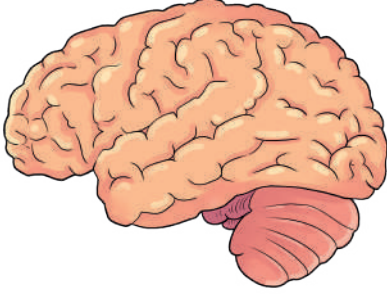
ছবি: মানব শরীরের কয়েকটি প্রধান তন্ত্র

৬. রেচনতন্ত্র (renal system): আমাদের শরীর থেকে তরল বর্জ্য বা মূত্র যাতে শরীরের বাইরে বের হয়ে আসতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের রেচনতন্ত্র কাজ করে, যা মূলত আমাদের বৃক্ক বা কিডনি, মূত্রনালি এবং মূত্রথলি ইত্যাদি অঙ্গ মিলে তৈরি হয়। মূত্র উৎপাদন এবং এর মাধ্যমে রক্ত থেকে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন যৌগ এবং অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ করে এই তন্ত্র।



ছবি: বৃক্ক বা কিডনি

৭. স্নায়ুতন্ত্র (nervous system): আমরা যে চিন্তা করতে পারি, সিদ্ধান্ত নিতে পারি, কারও ডাকে সারা দিতে পারি, শীত-গরম উপলব্ধি করতে পারি তা সম্ভব হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কারণে। আমাদের মস্তিষ্ক (brain), মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থানরত মেরুদণ্ডজু (spinal cord) এবং আমাদের শরীরের নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা স্নায়ু-সংযোগ মিলে তৈরি হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্র। গরম কোনো জিনিসে



ছবি: মস্তিষ্ক

হাত লেগে গেলে আমরা যখন ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিই, তখন আসলে কী ঘটে? জিনিসটা যে গরম সেই তথ্য হাতের ত্বকে থাকা স্নায়ুতন্ত্র মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকা মেরুদণ্ডজুর মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্কের কাজ হলো এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের অনুভূতি আর সাড়া দেওয়ার তাড়না সৃষ্টি করা। তার মানে এই ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক আমাদের হাতের ত্বকে যে শুধু গরম লাগার যে অনুভূতি তৈরি করে তাই নয়, বরং হাতটা ঝট করে সরিয়ে ফেলতেও নির্দেশ দেয়।

৮. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (endocrine system): আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ হয়। এদের কোনোটি শরীরের একটি অংশে তৈরি হয়, কিন্তু তারপর শরীরের বিভিন্ন অংশে গিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। এ ধরনের পদার্থকে বলা হয় হরমোন। এই হরমোনগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশে থাকা গ্রন্থিতে তৈরি হয়, আর এই গ্রন্থিগুলো মিলে তৈরি হয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমন্বয়ের জন্য এই তন্ত্র রাসায়নিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে।

৯. প্রজননতন্ত্র (reproductive system): অন্য সকল জীবের মতো মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে মানব প্রজাতির ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের শরীরে রয়েছে প্রজননতন্ত্র। আমাদের দেশের সামাজিক পরিবেশের কারণে অনেক সময় ছেলেমেয়েদের প্রজনন প্রক্রিয়ার বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানানো হয় না। সে কারণে বয়ঃসন্ধিকালে যখন এই তন্ত্র সক্রিয় হয়, তখন তার পরিবর্তনগুলো অনেক সময়েই তাদের কাছে আকস্মিক এমনকি আতংকের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করার জন্য এই তন্ত্রটির গঠনটি সবার সঠিকভাবে জানা উচিত। এই তন্ত্রের কিছু অংশ বাহ্যিক অঙ্গ হিসেবে দেখা যায় যা নারী-পুরুষের শরীরে আলাদা। তবে প্রজননতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসলে আমাদের দৃষ্টির বাইরে, শরীরের ভেতরে অবস্থান করে। যেমন, ছেলেদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়, প্রোস্টেট, শুক্রনালী ইত্যাদি, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়,

জরায়ু ইত্যাদি। প্রজননতন্ত্রের এসব অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ আমাদের প্রজননকোষ, যেমন শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু তৈরি করে।

১০.৬ বয়ঃসন্ধি

সকল জীবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার শারীরিক বৃদ্ধি এবং পরবর্তী বংশধর তৈরির জন্য নিজেস্বত্ব প্রস্তুত করা।

আমরা যখন মাঠে কোনো ফসলের বীজ বপন করি, তখন বীজগুলো থেকে অঙ্কুর গজায়, তারপর তারা ধীরে ধীরে বড় হয়। এক পর্যায়ে সেই গাছে আবার ফুল আসে, তাতে আবার নতুন বীজ তৈরি হয়। এভাবেই প্রকৃতিতে জীবসমূহ তাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্ম তৈরির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে।

মানব প্রজাতির ক্ষেত্রেও কথাটি সত্যি। আমরা চারপাশে তাকালে ছোট ছোট শিশু দেখতে পাই, তারপর তাদের তুলনায় বড় কিশোর বয়সীদের দেখি। আমাদের বাবা-মায়েরা পূর্ণবয়স্ক মানুষ আবার আমাদের দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানিরা হয়তো আরেকটু বেশি বয়স্ক। এই যে নানান বয়সের মানুষ, তাদের শরীরের বৃদ্ধি কিন্তু ধাপে ধাপে হয়। আমাদের পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনদের নতুন শিশু জন্ম নেওয়ার পরপরই কেবল আমরা তাদেরকে চোখের সামনে বড় হতে দেখি। কিন্তু মানব শিশু জন্মের এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু শুরু হয় আরও অনেক আগে থেকে মায়ের গর্ভে। সেই বিষয়ে আমরা উপরের শ্রেণিতে আরও বিস্তারিত জানব।

জন্ম নেওয়ার পর শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি হতে হতে একপর্যায়ে তারা কৈশোরে উদ্ভীর্ণ হয়। এই যে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছ, তোমরা কিন্তু এখন কৈশোরে আছ। একসময় তোমরাই শিশু ছিলে। তোমাদের শরীর ক্রমাগত বড় হচ্ছে। শরীরের এই বড় হওয়া কেবল আমাদের উচ্চতায় বড় হওয়া নয়, আমাদের শরীরের যত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে তার সবই বড় হচ্ছে। আমাদের বুকের ভেতরের হৃৎপিণ্ড (রক্ত সংবহনতন্ত্রের অঙ্গ), মাথার ভেতরের মস্তিষ্ক (স্নায়ুতন্ত্রের অঙ্গ) কিংবা পেটের ভেতরের বৃক্ক বা কিডনি (রেচনতন্ত্রের অঙ্গ)—এরা সবাই কিন্তু আমাদের বেড়ে ওঠা শরীরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড় হচ্ছে।

বয়সের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে আমাদের শরীরের প্রজননতন্ত্রের দৃশ্যমান অঙ্গগুলোও কিন্তু বড় হতে থাকে। ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অঙ্গগুলো তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। একটু পরেই আমরা সেই পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে জানব। তবে তার আগে বলা দরকার—এই প্রজনন অঙ্গগুলো সম্বন্ধে আমাদের নতুন অনুভূতি তৈরি হয় কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতরের বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে। একটু আগে তন্ত্রসমূহের আলোচনায় আমরা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এসব গ্রন্থি থেকে এক ধরনের বিশেষ রাসায়নিক সংকেতবাহী পদার্থ নিঃসরণ হয় যাদেরকে আমরা সাধারণ নামে হরমোন হিসেবে জানি।

কৈশোরের একপর্যায়ে নারী এবং পুরুষের শরীরে কিছু বিশেষ হরমোন তৈরি হওয়া শুরু হয়। নারী-পুরুষের শরীরভেদে আলাদা হয় বলে এসব হরমোনকে সেক্স হরমোন বা লিঙ্গভিত্তিক হরমোন বলা হয়। মূলত আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে এসব সেক্স হরমোনের যে নতুন যোগাযোগ হয় তার কারণেই আমরা আমাদের বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গগুলোর ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠি।

সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, তোমাদের শরীরের যে পরিবর্তন তার সঙ্গে তোমাদের মন তথা মস্তিষ্কেরও কিন্তু একটি পরিবর্তন হচ্ছে, যা তোমাদেরকে প্রজনন বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিপক্বতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রজনন বা জৈবিক পরিপক্বতা মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত অর্জিত হয় ১৬-১৮ বছরের পর থেকে। কিন্তু সেই পরিপক্বতার পথে যাত্রা শুরু হয় আরও আগে। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১১-১৩ বছরের মধ্যে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৯-১১ বছরের মধ্যে। এই যে বয়স, যখন মানুষ হিসেবে আমরা প্রজনন বিষয়ে পরিপক্বতার দিকে যাত্রা শুরু করি, এই বয়সটাই হচ্ছে আমাদের বয়ঃসন্ধি। আমাদের শিশুকাল (জন্ম থেকে ৮-৯ বছর) পেরিয়ে যৌবনের (১৮ বছরের পরবর্তী) পর্যায়ে যাত্রার শুরুটা এই ৯-১৩ বছরের মধ্যে হয় বলেই এই সময়টাকে বয়ঃসন্ধি বলা হয়। বয়ঃসন্ধির সময়টায় শরীর ও মনের পরিবর্তনগুলো জীব হিসেবে মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, বয়ঃসন্ধিতে শুরু হওয়া মানুষের শরীরের প্রজনন অঙ্গগুলোর দৃশ্যমান পরিবর্তন কিন্তু আরও কয়েক বছর ধরে চলতেই থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়। আর এসব কিছুই পেছনে কাজ করে শরীরে তৈরি হওয়া সেক্স হরমোন।



১০.৬.১ বয়ঃসন্ধিতে ছেলেদের শারীরিক পরিবর্তন

ছেলেদের শরীরের বিকাশ ও দেহ গড়নের পরিবর্তন একটি দীর্ঘ সময় ধরে চলে। এই পরিবর্তন বয়ঃসন্ধি সময় থেকে শুরু করে ৩০ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। অনেক পরিবর্তন আছে যা বয়ঃসন্ধি শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। নিচে বয়ঃসন্ধিকালীন কিছু পরিবর্তন তুলে ধরা হলো, যা তোমরা নিজেদের শরীরেই লক্ষ করতে পারো।

শুনতে অবাধ লাগলেও এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, ছেলেদের বয়ঃসন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য আসলে আমরা শুনতে পাই। আর তা হচ্ছে তাদের গলার স্বরে পরিবর্তন।

বয়ঃসন্ধিতে ছেলেদের গলার স্বর শিশু অবস্থার তুলনায় মোটা হয় যা তাদের শরীরের অন্যান্য পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত বহন করে।

ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির আরেকটি বিশেষ লক্ষণ হলো শরীরের বিভিন্ন অংশ সুঠাম ও সুগঠিত হতে থাকা। এই অংশগুলো হলো বুক, পিঠ, কোমর, নিতম্ব, উরু এবং পা। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত এই শারীরিক বিকাশ ঘটতে থাকে। মূলত এসময় ছেলেদের শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশি সুগঠিত হয়।

বয়ঃসন্ধির সময় থেকে ছেলেদের দেহের হাড়ের গঠন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একই সঙ্গে মজবুত কাঠামো লাভ করতে থাকে। শরীরের অনেক জায়গার হাড় চওড়া হতে থাকে। এই পরিবর্তনও বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে ৩০ বছরের অধিক বয়স পর্যন্ত ঘটতে পারে। এছাড়া অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনবোধ আমরা পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের কাছ থেকে আরও অনেককিছু জেনে নিয়ে সচেতন হতে পারি।

১০.৬.২ মেয়েদের ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের ইস্ট্রোজেন হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তাদের যোনিপথ, জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের গঠন ও কাজে পরিবর্তন আসে। শরীরের ভেতরে এই অঙ্গগুলো থাকে বলে এদের এই পরিবর্তন হয়তো খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে মেয়ে শিশুদের মাসিক বা পিরিয়ড নামক নিয়মিত শারীরিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে সাধারণত মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রক্তস্রাব শুরু হয়। একেই মাসিক বা পিরিয়ড বলা হয়। বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে মাসিক হওয়ার গড় বয়স ৯-১৩ বছর বলে ধরা হয়। নিয়মিত বিরতিতে মাসের নির্দিষ্ট সময়ে এই রক্তস্রাব হয় বলে এই ঘটনাটিকে রজঃচক্র বলা হয় (রজঃ শব্দটির অর্থই হচ্ছে রক্তস্রাব)। রজঃচক্র শুরু হওয়া মেয়েদের বয়ঃসন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এটি শারীরিক পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুতির পথে একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত। তবে মানসিক ও শারীরিকভাবে মেয়েরা পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক না হলে সন্তান ধারণ তার জন্য বিপদজনক, এমনকি জীবন সংকটের কারণও হতে পারে।

১০.৬.৩ শরীরের যত্ন

আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত এর যত্নের প্রয়োজন। কোভিড অতিমারির সময়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, শরীরের পরিচ্ছন্নতা এবং কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি আমাদের রোগ ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেমন দরকার, তেমনি নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ নিশ্চিত করাও জরুরি। আমাদের কিছু সাধারণ অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহযোগিতা করে। যেমন,

- নিয়মিত গোসল করা;
- হাত ও পায়ের নখ এবং চুল ছোট রাখা;
- খাওয়ার আগে ও পরে এবং টয়লেট ব্যবহারের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া;

☑ যেখানে সেখানে খুঁথু বা কফ না ফেলা;

☑ হাঁচি ও কাশির সময়ে নাক ও মুখ রুমাল বা টিস্যু বা হাতের কনুই দিয়ে ঢেকে রাখা।

এসব আচরণ ও অভ্যাস আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য যেমন ভালো রাখে, তেমনি আমাদের চারপাশের মানুষকেও সুস্থ থাকতে সহযোগিতা করে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের কী ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে তা তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ। আরেকটু বিস্তারিত জেনে নিতে চাইলে তোমরা তোমাদের ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা’ বই থেকে আমরা কৈশোরের যত্ন অধ্যায়টি পড়ে নিতে পারো।

এবার একটু ভেবে দেখো, এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কোন কোনটি তোমার ইতোমধ্যেই ঘটছে বা ঘটছে? এই সকল পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নিজের যত্ন নিতে তুমি কী কী করতে পারো তা একটু ভেবে দেখো। বয়ঃসন্ধিকালে শরীর ও মনের সুস্থতার জন্য প্রত্যেকের নিজের পরিবর্তনগুলো জেনে সে অনুযায়ী আত্মপরিচর্যা করা জরুরি। বিশেষ করে মেয়েদের মাসিক বা পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে কীভাবে নিজের পরিচর্যা করতে হয়, তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

নিচে তোমার নিজের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং নিজের যত্ন নেয়ার জন্য কী কী করণীয় তা লিখে রাখো:

তোমার শারীরিক পরিবর্তন:

.....

.....

.....

.....

মানসিক পরিবর্তন:

.....

.....

.....

.....

নিজের যত্ন নেয়ার উপায়:

.....

.....

.....

.....

.....

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদা যত্ন রয়েছে। আমাদের শরীরের যে অংশটুকু খোলা থাকে, তার যেমন যত্ন দরকার, তেমনি যে অংশটুকু পোশাকে ঢাকা থাকে তারও যত্ন দরকার। আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখতে হবে। আমাদের শরীরের ব্যক্তিগত কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঘাম ও ময়লা জমে জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। গোসলের সময় সাবান দিয়ে এসব অংশ পরিষ্কার করতে হবে।



খাবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা যেন সচেতনভাবে সুস্বাদু খাবার নির্বাচন করি তা খেয়াল রাখতে হবে। কেবল মুখে ভালো লাগলেই সে খাবার আমাদের শরীরের জন্য ভালো নাও হতে পারে। আমাদের সুস্থ শরীরের জন্য পুষ্টিকর খাবারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এছাড়া নিয়মিত ও সময়মতো ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে। সুস্থ শরীরের জন্য এক দিনের মধ্যে আমাদের প্রায় আট ঘণ্টা ঘুম দরকার। রাত ৯-১০টার মধ্যে ঘুমানোর

চেষ্টা করতে হবে। আর খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে আমাদের নিত্যদিনের কাজে নিযুক্ত হতে হবে।

আমাদের স্বাস্থ্যবিধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নিয়মিত খেলাধুলা বা শরীরচর্চা। সময় করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে শরীরচর্চা করতে হবে। এসব অভ্যাস ও জীবনচরণ আমাদের শরীর ও মন সুস্থ রাখতে সহযোগিতা করবে।

মানব শরীর অনেকগুলো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। এগুলোর সবকিছু আমরা সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করি না। আমাদের অজ্ঞাতেও শরীর তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালিয়ে যায়, যা আমাদের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যিক। তবে সচেতনভাবে আমরা যদি সঠিক যত্ন নিই, সঠিক খাবার খাই, নিয়মিত শরীর চর্চা করি, তবেই আমাদের শরীর থাকবে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম। তাই এসব বিষয়ে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

স্মরণীয়নী ?

- ১। বয়ঃসন্ধিকালে তোমার মধ্যে যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো ঘটেছে বা ঘটছে তার সাথে কি বইয়ের তথ্যগুলোর কোনো মিল দেখতে পাও?
- ২। নিজের শারীরিক ও মানসিক যত্নে তোমার কোন অভ্যেসটি তুমি পরিবর্তন করতে চাও?



ଅର୍ଧ୍ୟାୟ ୧୧

ଆଲୋ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- আলোর রং
- প্রতিফলন প্রতিসরণ ও শোষণ
- কীভাবে দেখি এবং রং এর ধরন

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, আমরা চোখে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আলো। তবে সেটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক একটা কথা হলো না, কারণ চোখে আমরা মানুষ, গাছপালা, আকাশ, মেঘ অনেক কিছু দেখি—সেগুলো কি আলো? না, সেগুলো আলো না কিন্তু সেগুলোতে আলো পড়ে বলে সেখান থেকে আলো যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন আমরা সেগুলোকে দেখি। যদি অন্ধকার হয়ে যায় কিংবা যখন আমরা চোখ বন্ধ করে কোনো আলোকে চোখে আসতে না দিই, তাহলে আমরা কিছুই দেখিনা।

তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ, একটা জবা ফুলকে কেন আমরা লাল দেখি আর জবা ফুলের পাতাকে কেন সবুজ দেখি? সেটি যদি বুঝতে চাও তাহলে আলো সম্পর্কে আমাদের আরও একটু জানতে হবে।

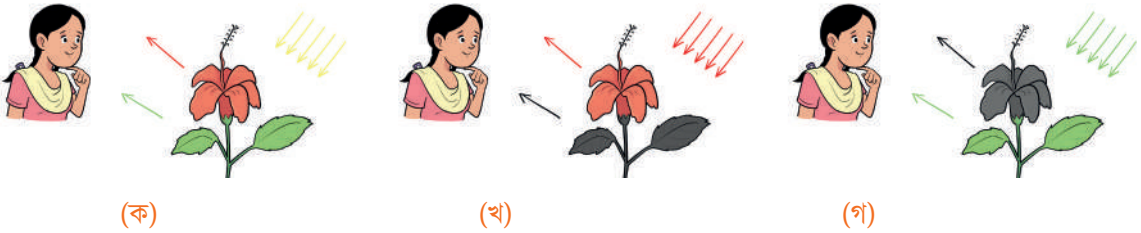


১১.১ আলোর রং

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে বিজ্ঞানী নিউটন পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন, সূর্যের আলো—যেটা বর্ণহীন কিংবা সাদা আলো সেটা আসলে বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল রং দিয়ে তৈরি। সবগুলো একসঙ্গে মিশে থাকলে আমাদের চোখে সেটাকে বর্ণহীন বা সাদা রং হিসেবে দেখা যায়। সূর্যের আলোতে যে এই সাতটি রং আছে সেটা আমরা নিজেরাও রংধনুতে দেখেছি, সেখানে সূর্যের আলো সাত রঙে ভাগ হয়ে যায়। গানের বা কম্পিউটারের যে সিডি পাওয়া যায়, সেখানে আলো প্রতিফলিত করলেও সেখানে সাতটি রংকে ভাগ হয়ে যেতে দেখা যায়।

কাজেই আমরা যখন একটা জবা ফুলকে লাল দেখি তার অর্থ সবগুলো রঙের সংমিশ্রণে তৈরি সাদা রং এই ফুলে পড়ার পর লাল ছাড়া অন্য সব রং শোষিত হয়ে গেছে—তাই সেখান থেকেই শুধু লাল রংটা বের হয়ে আমাদের চোখে পর্যন্ত আসতে পারছে। সে কারণে আমরা ফুলটা দেখছি লাল। ঠিক সেরকম আমরা গাছের পাতাকে সবুজ দেখি কারণ, সেখানে সব রঙের মিশ্রণ তৈরি সাদা আলো পড়ার পর সবুজ ছাড়া অন্য সব রং শোষিত হয়ে গেছে—তাই সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা সবুজ রংটা যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন আমরা সেটাকে সবুজ রঙের দেখি।

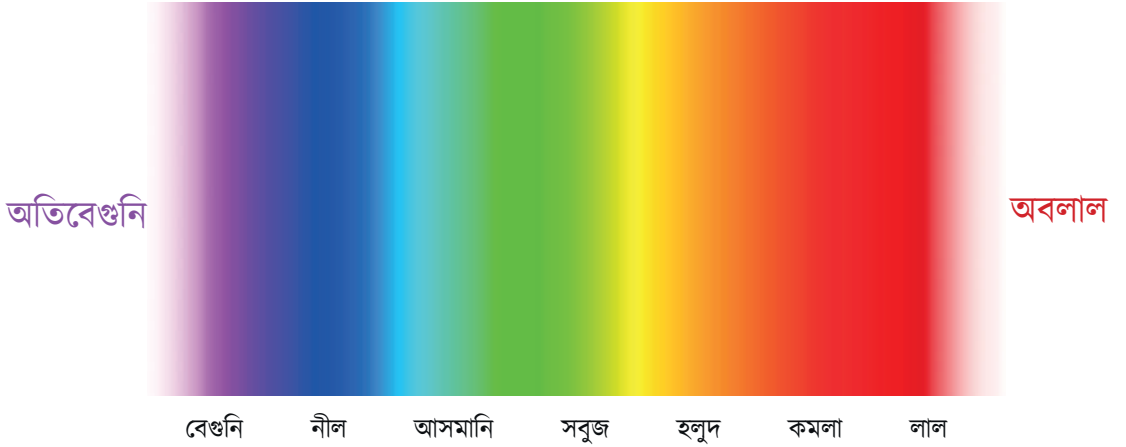
বিষয়টা যে সত্যি, তোমরা ইচ্ছা করলেই সেটা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো। লাল জবা ফুলকে তুমি যদি সবুজ আলোতে দেখার চেষ্টা করো তাহলে ফুলটাকে দেখবে কুচকুচে কালো! কারণ সবুজ রংটা জবা ফুলে শোষিত হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে কোনো রঙের আলোই বের হবে না, তাই সেটা দেখাবে কালো। ঠিক একই কারণে লাল আলোতে সবুজ পাতাটাকে দেখাবে কুচকুচে কালো।



(ক) সাদা আলোতে রঙিন জিনিস সঠিক রংয়ে দেখা যায় (খ) লাল আলোতে সবুজ রংয়ের জিনিস সঠিক রংয়ে দেখা সম্ভব নয় (গ) সবুজ আলোতে লাল রংয়ের জিনিস সঠিক রংয়ে দেখা সম্ভব নয়

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছ কোনো কিছুর রং কালো হওয়ার অর্থ সেখানে সব রং শোষিত হয়ে যায়। ঠিক সেরকম কোনো কিছুর রং সাদা হওয়ার অর্থ, সেখানে কোনো রং শোষিত হয় না! একটা কালো কাপড় আরেকটা সাদা কাপড় রোদে শুকাতে দিলে তুমি দেখবে কালো কাপড়টা অনেক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় কারণ কালো রং হওয়ার কারণে সেটি আলোর সব রং শোষণ করে রাখে বলে সেটা বেশি গরম হয়ে বেশি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে।

একটু আগে তোমাদের বলা হয়েছে সাদা আলোর রংগুলো যদি ভাগ করা হয় তাহলে সেখান থেকে রংগুলো যথাক্রমে বেগুনি নীল আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল এই ভাবে ভাগ হয়:



ছবি: দৃশ্যমান আলোর বাইরেও রয়েছে অতিবেগুনি ও অবলাল আলো

এবারে একটা বিচিত্র প্রশ্ন করা যাক, বেগুনির আগে কি কোনো রং আছে? আবার লালের পর কি কোনো রং আছে? সত্যি কথা বলতে কি বেগুনির আগের রংটির নাম অতিবেগুনি এবং লালের পরের রংটি হচ্ছে অবলাল! তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা সেই রংগুলো দেখতে পাই না! পোকামাকড় অতিবেগুনি রং খানিকটা দেখতে পায়, তাই দেখা যায়, পোকামাকড় ধরার জন্য অনেক সময় অতিবেগুনি ধরনের আলো ব্যবহার করা হয়। অবলাল রংটি টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোলেও ব্যবহৃত হয়। তোমার চোখে সেই রং দেখতে না পেলেও স্মার্টফোনের ক্যামেরা সেই রং দেখতে পারে, তাই তোমরা ইচ্ছা করলে একটা স্মার্টফোনের ক্যামেরার সামনে রিমোট কন্ট্রোল চেপে ধরে সেই আলোকে দেখতে পারো।

আলো কিন্তু একদিকে অতিবেগুনি রশ্মি অন্যদিকে অবলাল হয়েও শেষ হয়ে যায় না, সেটি দুইদিকে আরও বহুদূর বিস্তৃত হয়; তোমরা উপরের ক্লাসে সেগুলো জানতে পারবে।

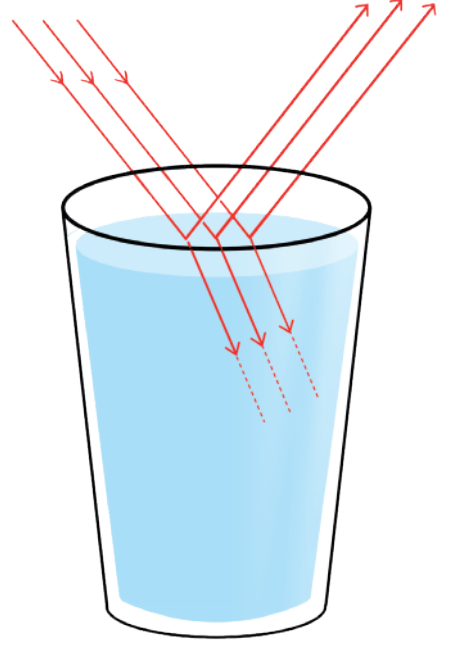
১১.২ প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও শোষণ

তুমি যদি জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর আসা সূর্যের আলোতে একটা গ্লাসে পানি কানায় কানায় ভর্তি করে রেখে দাও, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে পানির পৃষ্ঠদেশ থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঘরের ছাদে এসে পড়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে সূর্যের আলো প্রতিসরিত হয়ে পানির ভেতর দিয়ে

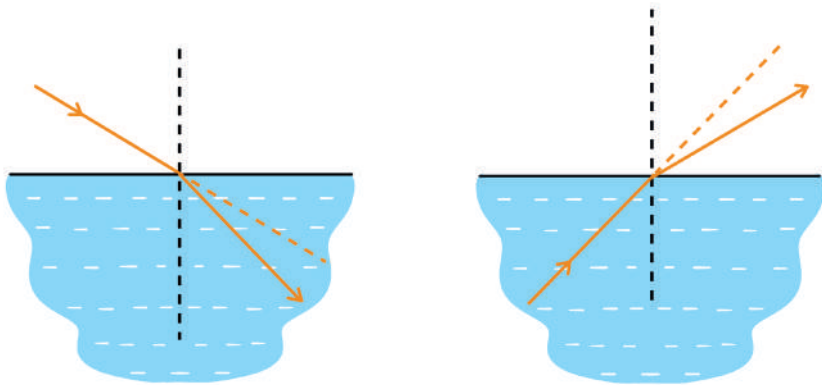
গ্লাসের ভেতরে ঢুকে গেছে। শুধু তাই না তুমি যদি গ্লাসের পানিটা দীর্ঘ সময় রোদে রেখে দাও, তাহলে দেখবে পানিটা একটুখানি গরম হয়েছে, যার অর্থ সূর্যের আলো খানিকটা শোষিত হয়েছে।

এখানে বাতাসে ছিল একটা মাধ্যম, সূর্যের আলো সেই মাধ্যম থেকে অন্য আরেকটি মাধ্যমে পানিতে এসে পড়েছে। আলো যখনই একটা মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে এসে পড়ে তখনই প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং শোষণ এই তিনটি প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। কতটুকু আলো প্রতিফলিত হয়ে বাইরে বের হয়ে যাবে, কতটুকু প্রতিসরিত হয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে এবং কতটুকু শোষিত হবে, সেটি নির্ভর করে মাধ্যম দুটির প্রকৃতির উপর, কত কোণে আলোটি এসে পড়েছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

একটু আগেই তোমরা জানতে পেরেছ একটা জিনিসের রং কী তার ওপর নির্ভর করে কোন রং কতটুকু শোষিত হবে। খালি চোখে যেটাকে স্বচ্ছ বা রংহীন মনে হয় সেটাতেও কিন্তু কমবেশি রং শোষিত হয়।

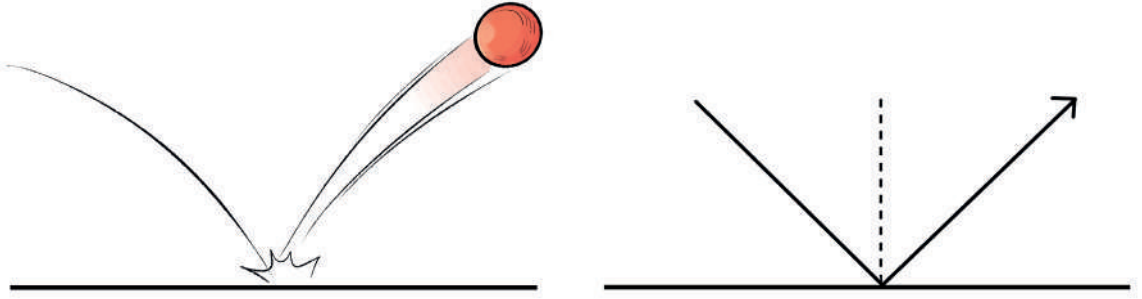


ছবি: আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং শোষণ



ছবি: বাতাস থেকে পানিতে এবং পানি থেকে বাতাসে আলোর প্রতিসরণ

আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ কিছু নিয়ম মেনে চলে। একটা সমতল মেঝেতে একটা বল ছুড়ে মারলে সেটা যেভাবে ঠিক বিপরীত দিকে একই কোণে ছুটে যায়, আলোর প্রতিফলনের বেলায় ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো ঠিক একইভাবে বিপরীত দিকে প্রতিফলিত হয়।

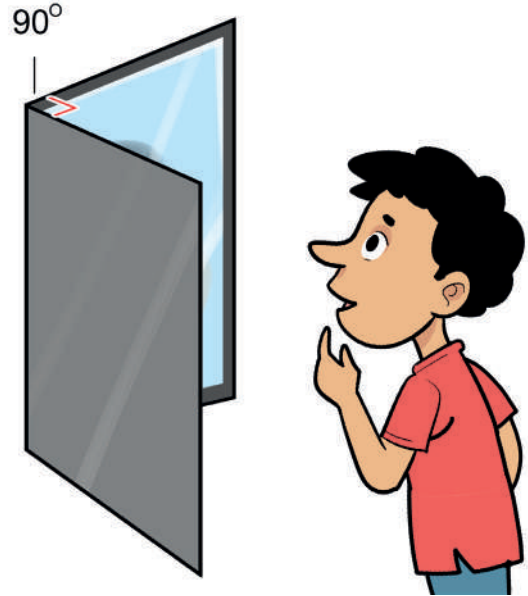


ছবি: আলোর প্রতিফলন মেঝে থেকে বল ধাক্কা খেয়ে উপরে ওঠার মতো।

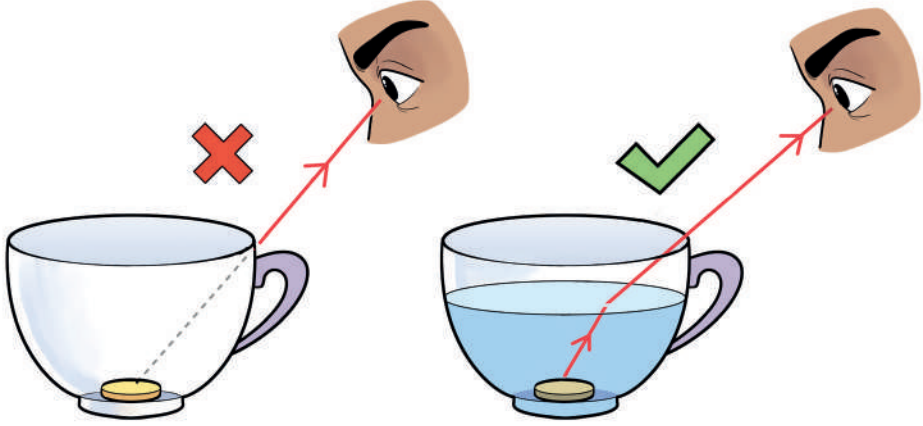
আলোর প্রতিফলন আমাদের খুবই পরিচিত একটা ব্যাপার। আমরা প্রতিদিন আয়নায় আমাদের মুখ দেখি! আয়নায় নিজের চেহারা দেখার সময় আমরা সব সময় একটা বিষয় লক্ষ করেছি, প্রতিফলিত চেহারায় ডান এবং বাম সব সময় অদল বদল হয়ে যায়। তোমরা কি কখনো এটি কেন হয় চিন্তা করে দেখেছ? তোমরা কি এমন একটি আয়না তৈরি করতে পারবে যেখানে আমরা আমাদের চেহারা দেখলে দেখব আমাদের ডান এবং বাম অদল বদল হয়নি?

কাজটি কঠিন নয়। ছবিতে দেখানো উপায়ে দুইটি আয়না ৯০ ডিগ্রি কোণে রাখো, দেখবে সেখানে তোমার চেহারা অদল বদল হয়নি। ডান হাত উপরে তুললে প্রতিফলিত চেহারাও ডান হাত উপরে তুলবে? কেন এটা হয় বলতে পারবে?

আলোর প্রতিসরণের আরও চমকপ্রদ একটা ব্যাপার ঘটে। আমরা সব সময়ই দেখে অভ্যস্ত যে আলো সরলরেখায় যায়। কিন্তু আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ঢোকার চেষ্টা করে, তখন কিন্তু সেটা সরলরেখায় যায় না—আলোটা বাঁকা হয়ে ঢোকে। যদি হালকা মাধ্যম (বাতাস) থেকে ঘন (পানি) মাধ্যমে যায়, তাহলে আলোর রেখাটি ভেতরের দিকে বেঁকে যাবে। যদি আলোটা ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যায়, তাহলে বাইরের দিকে বেঁকে যায়। বিষয়টা যে সত্যি তুমি সেটা খুব সহজে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। একটা খালি কাপে একটা মুদ্রা রাখো যেন মুদ্রাটা তুমি দেখতে পারো। আলো যেহেতু সরলরেখার যায়, তাই বলা যায় এখন



ছবি: সমকোণে রাখা দুটি আয়নায় প্রতিফলনে ডান-বাম উল্টে যায় না।



ছবি: পানি থেকে বাতাসে যাওয়ার সময় আলোক রশ্মি বাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

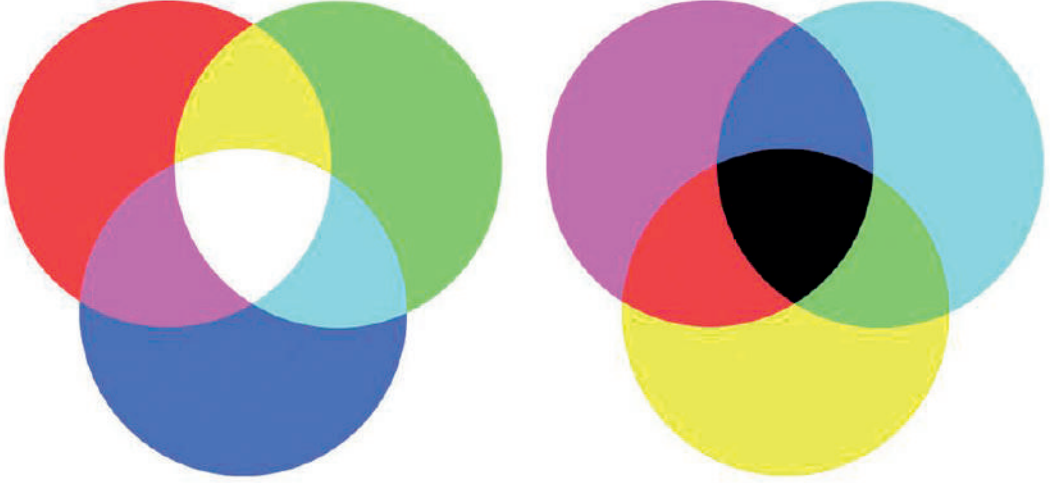
মুদ্রাটা এবং তোমার চোখে এক সরলরেখায় আছে। এবারে তুমি তোমার মাথাটা ধীরে ধীরে পিছিয়ে নিতে থাকো যেন মুদ্রাটা আর দেখা না যায়। এবারে কাপটাতে পানি ঢালতে থাকো, দেখবে মনে হবে মুদ্রাটা উপরে উঠে এসেছে এবং তুমি আবার সেটাকে দেখতে পাচ্ছ। আসলে মুদ্রাটা মুদ্রার জায়গাতেই আছে, আলোটাই বাঁকা হয়ে চোখে আসছে বলে আমরা সেটাকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রতিসরণ ব্যবহার করেও আমরা অনেক কাজ করে থাকি। বাতাস থেকে কাচের ভেতর যাওয়ার সময় আলোর বেঁকে যাওয়ার ধর্ম ব্যবহার করে লেন্স তৈরি করা হয়। সেই লেন্স দিয়ে চোখের চশমা থেকে শুরু করে ক্যামেরা, দূরবিন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র—এরকম নানা ধরনের ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়।

১১.৩ কীভাবে দেখি এবং রংয়ের ধরন

তোমরা তোমাদের বই থেকে শুরু করে টেলিভিশন, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ এরকম অনেক জায়গায় নানা ধরনের রং দেখে অভ্যস্ত। তোমাদের মনে হতে পারে এই রংগুলো তৈরি করার জন্য বুদ্ধি সবগুলো রং ব্যবহার করতে হয়। আসলে সেটা সত্যি নয়, আমাদের চোখ মাত্র তিনটি রং দিয়ে সব রং দেখতে পারে। বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য একটা স্মার্টফোনের স্ক্রিনে খুব সাবধানে ভিজে আঙুল ঝাঁকুনি দিয়ে খুবই সূক্ষ্ম একটা পানির বিন্দু রাখো তখন সেই পানির ফোঁটাটি কনভেক্স লেন্স হিসেবে কাজ করবে। তুমি দেখবে লাল, সবুজ এবং নীল, মাত্র এই তিনটি রং দিয়ে স্মার্টফোনের স্ক্রিনে সব রং তৈরি করা হয়।

রঙিন আলো যখন চোখে এসে পড়ে তখন আমাদের চোখের রেটিনাতে এই লাল, নীল এবং সবুজ রঙের সংবেদী কোষগুলো নির্দিষ্ট রঙের অনুভূতি তৈরি করে এবং ভিন্ন ভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রংগুলো দেখতে পাই। কোন কোন রঙের সংমিশ্রণে কোন কোন রং তৈরি হয়, সেটা বাম দিকের ছবিতে দেখানো হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ সমান পরিমাণ লাল, নীল এবং সবুজ রং দিয়ে সাদা রং তৈরি হয়।



ছবি: বাম দিকের ছবিতে তিন রংয়ের আলোর মিশ্রণে তৈরি করা রং, কম্পিউটারের, টেলিভিশনের কিংবা স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে যেভাবে রং তৈরি করা হয়। ডান দিকের ছবিতে কাগজে রংতুলি দিয়ে মিশিয়ে তৈরি করা রং।

এখানে তোমাদের অন্য একটা বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া যায়, তুমি যদি একটা কাগজে রংতুলি দিয়ে লাল নীল সবুজ রং মিশাও তুমি কিন্তু বাম দিকের ছবিতে দেখানো রংগুলো পাবে না, ভিন্ন কিছু রং পাবে, সেই রংগুলোও ডান দিকের ছবিতে দেখানো হয়েছে। তোমরা যারা ছবি আঁকো তারা নিজেরাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ হলুদ লাল এবং নীল রং দিয়ে অন্য সব রং তৈরি করে ফেলা যায়।

স্মার্ট ফোন, টেলিভিশন কিংবা কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে আমাদের চোখের মধ্যে একই সঙ্গে লাল, নীল এবং সবুজ আলোর সংমিশ্রণ এসে পড়ে এবং চোখ তার জন্য নির্দিষ্ট রঙের অনুভূতি তৈরি করে। কাগজে রং মেশানোর সময় একটি রঙের কণার ওপর অন্য একটি রঙের কণা চলে আসার কারণে উপরের কণাটি নিচের কণার রং শোষণ করে, এবং যে রংটি শোষিত হয় না, শুধু সেটি বের হয়ে আসে। তখন তোমার চোখে লাল, নীল আর সবুজ রঙের মিশ্রণ এসে পড়ে না, শোষিত না হওয়া প্রকৃত রংটিই এসে পড়ে এবং তুমি সেই রংটিই দেখো।

স্নুশীলনী ?

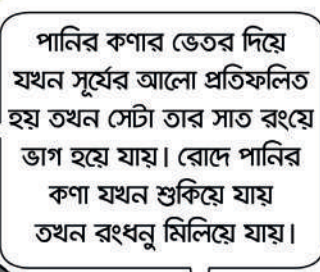
- ১। রংধনু কেন বৃত্তাকার হয়?
- ২। ভরদুপুরে কেন কখনো রংধনু দেখা যায় না?

বৃষ্টি





একটু পর



তোমরা রোদে পানি ছিটিয়ে নিজেরাও রংধনু তৈরি করতে পারবে! সূর্যের বিপরীতে হবে রংধনু।

একটু পর



আরেকটু পর





ଅଧ୍ୟାୟ ୧୨

ଜୀବର ପୁଷ୍ଟି ଓ ବିପାକ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া
- ☑ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও টিকে থাকা
- ☑ উদ্ভিদের পানি ও খনিজ উপাদান পরিবহন ব্যবস্থা
- ☑ প্রাণীর পুষ্টি পরিশোধণ ও ব্যবহার

তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধা পেলে খাবার খাও। অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলে দুর্বল বোধ করো। চারপাশে তাকালে দেখবে অন্য সব প্রাণীই খাবার খাচ্ছে। কখনো কি ভেবেছ উদ্ভিদের কথা? উদ্ভিদেরও কি খাবার দরকার হয়? তারা কীভাবে খাবার জোগাড় করে?

কেবল উদ্ভিদ বা প্রাণীই নয় প্রকৃতির সকল জীবের জীবন ধারণ এবং টিকে থাকার জন্য খাবার প্রয়োজন হয়। জীব এসব খাবার ভেঙে পুষ্টি উপাদান তার কোষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।

যেকোনো জীবের বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন। সরল জীব, যেমন এককোষী ব্যাকটেরিয়া, স্ট্রিচ, কিংবা ছত্রাক পরিবেশ থেকে প্রায় সরাসরি পুষ্টির উপাদান গ্রহণ করে। অপর দিকে জটিল জীব, যেমন বড় উদ্ভিদ কিংবা মানুষ জটিল পদ্ধতিতে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ ও ব্যবহার করে।

তবে সবার ক্ষেত্রেই একটি কথা প্রযোজ্য—সকল জীবই তার পুষ্টির প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে জীবকে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—স্বভোজী বা অটোট্রপিক (autotrophic) এবং পরভোজী বা হেটারোট্রপিক (heterotrophic) জীব।

যেসব জীব পরিবেশ থেকে কার্বন, পানি ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাদের খাবার তৈরি করে নিতে পারে তাদেরকে বলা হয় স্বভোজী জীব। যেমন—বিভিন্ন ক্লোরোফিলধারী অণুজীব, সবুজ শৈবাল, উদ্ভিদ ইত্যাদি।

অপরদিকে যেসব জীব পরিবেশের অন্যান্য জীব থেকে খাবার (অর্থাৎ বিভিন্ন জৈব উপাদান, যেমন—আমিষ বা প্রোটিন, লিপিড বা স্নেহ, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা) সংগ্রহ করে তাদেরকে পরভোজী জীব বলা হয়। যেমন, বিভিন্ন প্রাণী—মানুষ, বাঘ, মুরগি ইত্যাদি।

এ তো গেল কীভাবে কার্বনসমৃদ্ধ জৈব উপাদান তৈরি করছে সেই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে জীবের শ্রেণিবিভাগ। কিন্তু আবার যদি আমরা দেখি, জীব কীভাবে পরিবেশ থেকে শক্তি (energy) সংগ্রহ করে তবে সেই বিবেচনায়ও জীবকে মূলত দুই ভাগে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এবার আমরা সেই বিষয়ে জানব।



পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য যা আমাদের আলোকশক্তি প্রদান করে। এই আলোকশক্তিই আবার নানান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে সঞ্চিত হয়।

শক্তির প্রাথমিক উৎস হিসেবে কিছু জীব সূর্যের আলোকে সরাসরি ব্যবহার করে এবং জটিল জৈব অণু (শর্করা) তৈরি করে। এদেরকে বলা হয় ফটোট্রপিক বা স্বালোকপোষিত জীব। যেমন, সবুজ উদ্ভিদ ও সবুজ শৈবাল, সা্যানোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। এরা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরি করে।

অপরদিকে কিছু জীব রাসায়নিক পদার্থকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। এদেরকে বলা হয় কেমোট্রপিক বা রাসায়নিকপোষিত জীব। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এই ধরনের জীবনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা মানুষও কিন্তু কেমোট্রপিক

জীব। কারণ, আমরাও সূর্যের আলো কাজে লাগিয়ে সরাসরি খাবার উৎপাদন করতে পারি না। আমরা উদ্ভিদ কিংবা অন্য জীব থেকে পাওয়া উপাদান খেয়ে আমাদের শক্তির চাহিদা মেটাই।

এতক্ষণ পর্যন্ত মূলত আমরা কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত পুষ্টি উপাদান নিয়েই কথা বলেছি। তবে এগুলোর বাইরে আরও কিছু রাসায়নিক উপকরণ জীবের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হয়। যেমন—নাইট্রোজেন, ফসফরাস, এবং পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, আয়রন, জিংক, কপার, ম্যাংগানিজ ইত্যাদি যুক্ত খনিজ লবণ।

১২.১ অণুজীবে পুষ্টি উপাদান পরিশোধন

এককোষী অণুজীবগুলো কর্তৃক তাদের পুষ্টি উপাদান পরিশোধন সরল প্রকৃতির হয়। তাদের কোষটি সরাসরি পুষ্টি উপাদানের সান্নিধ্যে থাকে, যা তাদের পুষ্টিপ্রাপ্তিকে তুলনামূলকভাবে সহজ করে তোলে।

অনেক সময় পুষ্টি উপাদান পরিবেশ থেকে সরাসরি কোষঝিল্লি ভেদ করে অণুজীবের কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। আবার কখনো কখনো পুষ্টি উপাদানকে পরিবেশ থেকে কোষের ভেতরে নেওয়ার জন্য কোষঝিল্লির কিছু বাহক সহযোগিতা করে।

এককোষী অণুজীবের উপরোক্ত পুষ্টি গ্রহণ প্রক্রিয়াগুলোই মূলনীতি হিসেবে বহুকোষী বড় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে কাজ করে।

১২.২ উদ্ভিদের পুষ্টি ও পরিশোধন

আমরা সাধারণত উদ্ভিদ বলতেই স্বভোজী জীব বলে মনে করি। অর্থাৎ তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা পুরো সত্যি নয়। অনেক উদ্ভিদ আছে যারা তাদের পুষ্টি সংগ্রহের

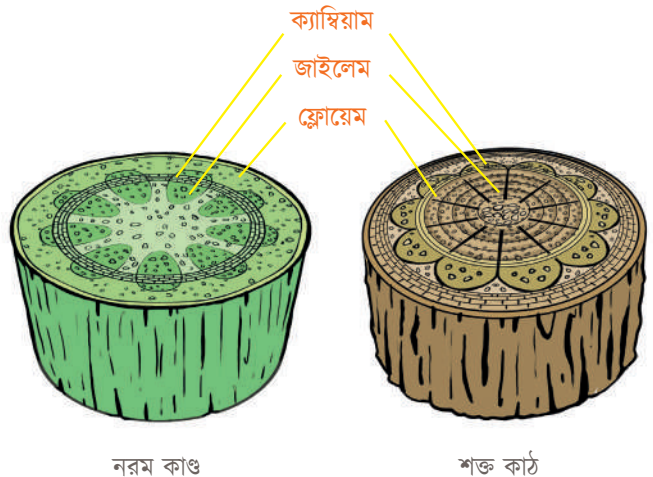
জন্য অপর উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে। যেমন—স্বর্ণলতা, এর কোনো ক্লোরোফিল নেই। ক্লোরোফিল হলো এক ধরনের সবুজ কণা যার মাধ্যমে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে পারে। স্বর্ণলতায় ক্লোরোফিল না থাকার ফলে তারা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজেরা কোনো খাবার তৈরি করতে পারে না। তাদের পুষ্টি উপাদানের জন্য তারা অপর উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে।

অধিকাংশ উদ্ভিদের বড় বড় চ্যাপ্টা পাতা থাকে যেগুলোর মাধ্যমে তারা সূর্যের আলো শোষণ করে। আমরা জানি, এই সূর্যের আলো ব্যবহার করে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ (photosynthesis) বলে। গাছের পাতার ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) নামক অঙ্গাণুতে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে থাকে। সালোকসংশ্লেষণ করার জন্য সূর্যের আলো ছাড়াও পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড এর প্রয়োজন হয়। গাছের শিকড় এবং কাণ্ড মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ সংগ্রহ করে এবং গাছ তার পাতার পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। কার্বন ডাই অক্সাইড, পানি ও সৌরশক্তি ব্যবহার করে ক্লোরোপ্লাস্ট গ্লুকোজ রূপে গাছের খাদ্য তৈরি করে থাকে।

সালোকসংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার কারণেই অক্সিজেন তৈরি হয় এবং এই অক্সিজেন গাছ পরিবেশে ছেড়ে দেয়। তৈরিকৃত গ্লুকোজের কিছু অংশ গাছের পাতায় সঞ্চিত থাকলেও অধিকাংশই কাণ্ড ও মূলে চলে যায় এবং সেখানেই জমা থাকে। বাজারে গেলে ফল এবং সবজির দিকে খেয়াল করে দেখো। সব ফল এবং সবজি উদ্ভিদ থেকে আসে, যারা সূর্যের আলোর শক্তি খাদ্য হিসেবে জমা করে। মিষ্টি আলু এবং গাজর তাদের মূলে খাদ্য সঞ্চয় করে, যা আমরা খেয়ে থাকি। আলু, আখ এবং আদা তাদের কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চয় করে। যখন মানুষ চা পান করে তখন পাতার নির্যাস খায়। আবার যখন তারা পালংশাক বা বাঁধাকপি জাতীয় সবজি খায়, তখন তারা মূলত পাতা খায়, ফুলকপি এবং ব্রকলি হলো ফুল যেগুলো আমরা খাই।

যেসব পশুপাখি গাছ, গাছের পাতা কিংবা ফল খেয়ে থাকে, তারা এসবে বিদ্যমান গ্লুকোজ থেকে তাদের শক্তি পায়। এমনকি বীজও আমরা খেয়ে থাকি, যেমন শিমের বীজ, চাল বা বাদাম। বীজের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে বলে উদ্ভিদের বীজ অনেক পুষ্টি সম্পন্ন হয়। আবার কোনো উদ্ভিদ আছে যারা কীটপতঙ্গ থেকেও পুষ্টি সংগ্রহ করে—এদেরকে পতঙ্গভুক উদ্ভিদ বলে। তবে তারা নিজেরাও নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে।

উৎস স্থান থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পুষ্টির উপাদানগুলো পরিবহণ করার জন্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোষ এবং টিস্যু থাকে যারা পুষ্টি পরিবহনের এই কাজগুলোতে নিযুক্ত থাকে। এদেরকে বলা হয় জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু। এই টিস্যুগুলোকে উদ্ভিদের দেহের ভেতরে থাকা কিছু



ছবি: উদ্ভিদের কাণ্ডের টিস্যুবিন্যাস

সুনির্দিষ্ট পথের সঙ্গে তুলনা করা যায় যাদের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট উপাদানগুলো চলাচল করে। মাটি থেকে মূলের মাধ্যমে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ উপাদান শোষণ করে তা পরিবহণ করার কাজটি করে জাইলেম টিস্যু। অপরদিকে উদ্ভিদের সবুজ পাতায় তৈরি হওয়া পুষ্টি উপাদান (যেমন, শর্করা) উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে পৌঁছে দেওয়ার পথটি হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যু দিয়ে তৈরি।

উদ্ভিদের পরিবহনে সহযোগিতার পাশাপাশি জাইলেম ও ফ্লোয়েম উদ্ভিদকে দৃঢ়তাও প্রদান করে। আণুবীক্ষণিকভাবে জাইলেম টিস্যুকে ঘিরে ফ্লোয়েম টিস্যুর অবস্থান দেখা যায়।

১২.৬ প্রাণীর পুষ্টি ও পরিশোধন

উদ্ভিদ ও প্রাণীর অন্যতম বড় পার্থক্য হচ্ছে তাদের খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনায়। কোনো প্রাণীই নিজের কোষের ভেতর খাদ্য তৈরি করতে পারে না। ফলে খাদ্যের জন্য প্রাণীকে উদ্ভিদ বা অন্য কোনো জীব বা অণুজীবের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমরা যখন শাকসবজি, ভাত, মাংস, মাছ ইত্যাদি খাই, তখন আমরা আসলে পুষ্টি উপাদান যেমন—শর্করা, আমিষ, লেহু ইত্যাদি গ্রহণ করি। এর বাইরে আমাদের খনিজ উপাদান যেমন—ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, ভিটামিন ইত্যাদিও প্রয়োজন হয়।

এসব উপাদানও আমরা আমাদের গ্রহণ করা বিভিন্ন খাবার থেকে পাই।

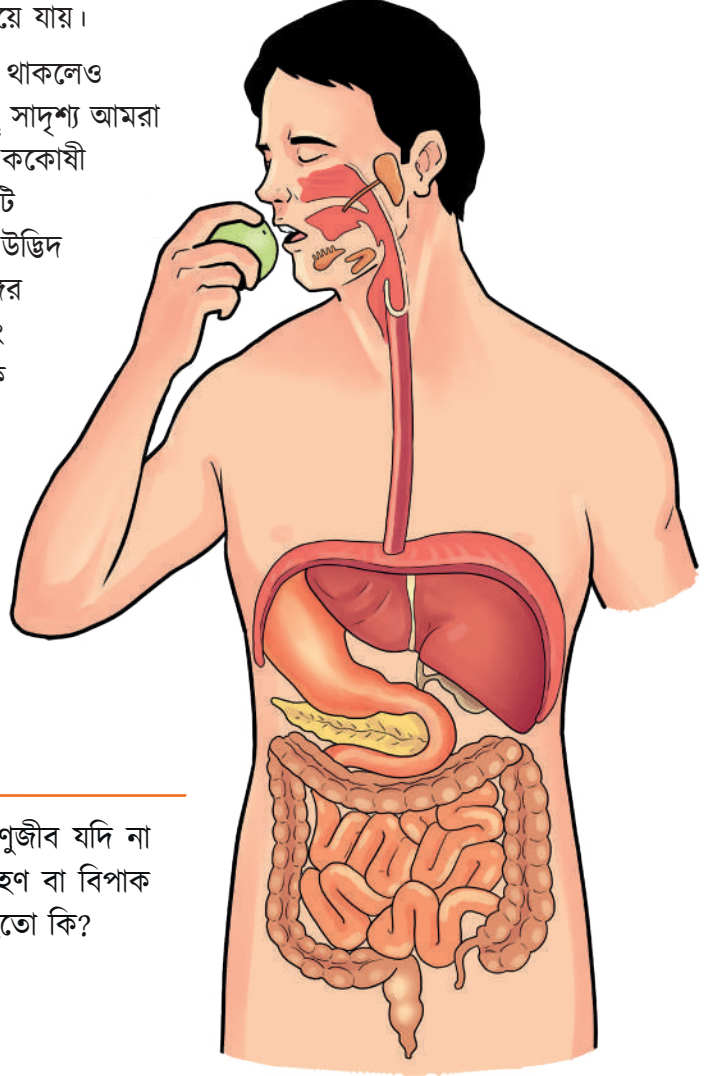
এর আগে আমরা দেখেছি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তার পুষ্টি উপাদান পরিশোধন ও পরিবহনের জন্য বিশেষ টিস্যু রয়েছে। প্রাণীর ক্ষেত্রেও তার পুষ্টি গ্রহণ ও পরিশোধনের বিষয়টি নির্দিষ্ট কোষ, টিস্যু এবং অঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন—মানুষের ক্ষেত্রে পরিপাকতন্ত্র রয়েছে। এই পরিপাকতন্ত্র জটিল খাদ্য ভেঙে কোষের ব্যবহার উপযোগী পুষ্টি উপাদানে পরিণত করে যা রক্তে শোষিত হয়ে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।



ছবি: বিভিন্ন ধরনের খাদ্য

খাদ্য পরিপাকের বিষয়টি শুরু হয় আমাদের মুখ থেকে। আমরা যখন ভাত, রুটি বা মাছ খাই, তখন আমাদের দাঁতের মাধ্যমে সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করি, আমাদের জিহ্বার নিচে অবস্থিত লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা আমাদের খাবার পরিপাকে সহযোগিতা করে। এরপর খাবার আমাদের পাকস্থলীতে যায়। সেখানকার বিশেষ পরিবেশে খাদ্যকে আরও ভালোভাবে পরিপাক করে। এসব ধাপ শেষে আমাদের গ্রহণ করা খাবার ভেঙে ছোট ছোট জৈবঅণুতে পরিণত হয়। এই পাকস্থলী এবং তার পরের ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্রে বিশেষ পরিশোধক কোষ আছে যেগুলো পরিপাক করা খাবার থেকে ওই সব ছোট ছোট পুষ্টি উপাদান শোষণ করে রক্তের মাধ্যমে পুরো শরীরে বয়ে নিয়ে যায়।

অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৌলিক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক জায়গায় তাদের ভেতর বেশ কিছু সাদৃশ্য আমরা উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পাই। এককোষী ব্যাকটেরিয়া তার সব বিপাকীয় কাজ একটি কোষের ভেতর সম্পন্ন করলেও বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীতে কাজগুলো বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে এসব টিস্যু এবং অঙ্গের এক একটি কোষের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে এককোষী জীবের প্রক্রিয়াগুলোর মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায় যে, সকল জীব কিছু মৌলিক নিয়মকে ভিত্তি করে এই পৃথিবীতে বিকশিত হয়েছে।



স্রুশীলনী ?

১। পৃথিবীতে কোনো অণুজীব যদি না থাকত, মানুষের পুষ্টি গ্রহণ বা বিপাক ক্রিয়ায় কোনো সমস্যা হতো কি?



অধ্যায় ১৬

সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন ও
তাদের আপেক্ষিক অবস্থান

সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন ও তাদের আপেক্ষিক অবস্থান

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ দিন-রাত ও ঋতু পরিবর্তন
- ☑ আঙ্গিক গতি ও বার্ষিক গতি
- ☑ ভৌগোলিক রেখা
- ☑ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার পার্থক্য
- ☑ পৃথিবীর ওপর চাঁদের প্রভাব
- ☑ সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থান

সৌরজগতে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আবার চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সে কারণে বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে দিব্যারাত্রির পরিবর্তন, অমাবস্যা-পূর্ণিমা এবং ঋতুর পরিবর্তন ঘটে থাকে।

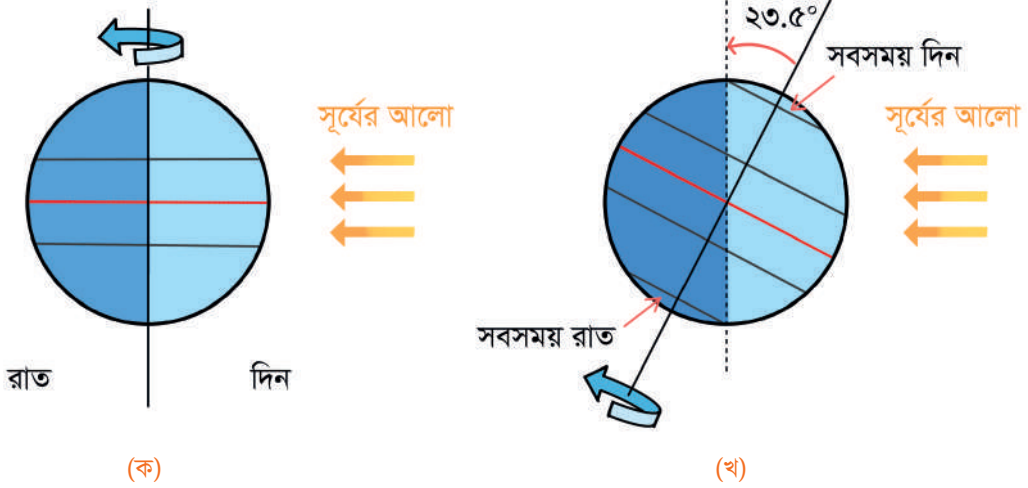
১৩.১ দিন-রাত ও ঋতু পরিবর্তন

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবে যে বছরের সব সময় দিন এবং রাত সমান দৈর্ঘ্যের হয় না। গ্রীষ্মকালে দিনগুলো হয় লম্বা, বিকেলে স্কুল ছুটির পর খেলাধুলার জন্য অনেকটা সময় পাওয়া যায়। আবার শীতকালে দিন হয় ছোট, দেখা যায় সূর্য উঠতে সকালে অনেক দেরি হয়, আবার সন্ধ্যা অনেক তাড়াতাড়ি নেমে আসে। এ সবকিছুই হয় পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণন বা আঙ্গিক গতি এবং সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতির কারণে।

১৩.১.১ আঙ্গিক গতি

মহাকাশে পৃথিবী স্থির নয়, সেটি তার নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের দিক হচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে সে জন্য আমরা সূর্যকে পূর্বদিকে উদয় হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখি। এই ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্য থেকে আসা আলো এবং অক্ষকারের একটি চক্র ২৪ ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়

যাকে আমরা দিন-রাত বলি। পৃথিবী যদি পুরোপুরি খাড়াভাবে নিজ অক্ষে ঘুরত তাহলে পুরো পৃথিবীর সব জায়গায় ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত হতো। কিন্তু পৃথিবীর অক্ষ যেহেতু ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে নিজ অক্ষের উপর ঘোরে, তাই কোথাও দিন লম্বা, কোথাও ছোট, এমনকি উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি একটানা অনেকদিন ধরে দিন এবং অনেকদিন ধরে রাত থাকতে পারে।



(ক) পৃথিবী যদি তার অক্ষে খাড়াভাবে ঘুরতো তাহলে সবজায়গায় ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত হতো। ঋতুর কোনো পরিবর্তন হতো না (খ) পৃথিবী যেহেতু তার কক্ষপথের সাপেক্ষে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে ঘুরে কোথাও লম্বা এবং কোথাও ছোট দিন পাওয়া যায়।

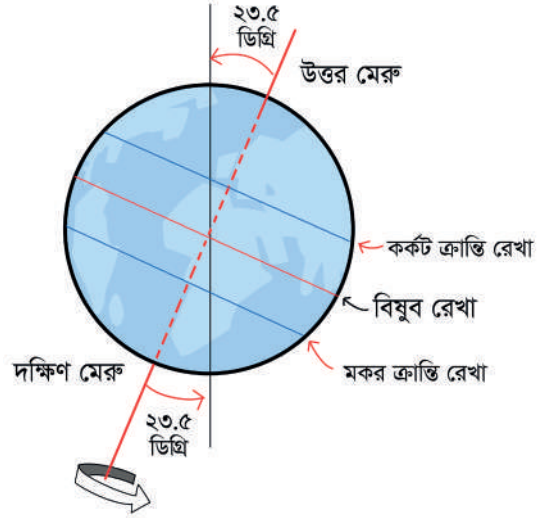
১৩.১.২ বার্ষিক গতি

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে একবার ঘুরে আসে। প্রতি বছরে ৩৬৫ দিনের পর বাড়তি ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড থেকে যাওয়ায় চার বছর পর সেটি বেড়ে বেড়ে প্রায় একদিনের সমান হয়ে যায় তাই সেটাকে হিসেবের মধ্যে আনার জন্য চার দিয়ে বিভাজ্য বছরগুলোতে ফেব্রুয়ারি মাসে ১ দিন যোগ করে ২৮ এর বদলে ২৯ দিনে মাস গণনা করা হয়। এই বছরগুলোকে লিপ ইয়ার বলে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর একটি পূর্ণাঙ্গ আবর্তনকালকে বার্ষিক গতি বলা হয়। আমরা এই সময়কে পৃথিবীতে একটি বছর হিসেবে গণনা করি।

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ পুরোপুরি খাড়া না হয়ে ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে থাকার কারণে দিন-রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। সূর্যের আলো যেখানে যত খাড়া বা লম্বভাবে পড়বে, সেই স্থান তত বেশি সূর্যের উত্তাপ পাবে এবং গরম হবে। আবার বছরের অন্য সময় যখন সূর্যের আলো বাঁকাভাবে পড়বে, তখন সূর্যের আলো অনেক বড় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে বলে কম উত্তাপ পাবে। সে কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়। তবে আগে আমরা দেখি পৃথিবীর অক্ষ ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকা বলতে কী বোঝায়। পৃথিবীর কক্ষপথকে যদি আমরা একটি সমতল পৃষ্ঠ বা থালা হিসেবে ধরি তবে তার ওপর একটি লম্ব কল্পনা করলে পৃথিবীর কক্ষপথ সেই লম্বের সঙ্গে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণ তৈরি করবে।

১৩.১.৩ ভৌগোলিক রেখা

পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করার জন্য তার ওপর কয়েকটি কাল্পনিক রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেখাটির নাম বিষুবরেখা এবং এটি পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। বিষুব রেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করেছে। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ রেখা দুটির নাম কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তি। কর্কটক্রান্তি রেখাটি বিষুবরেখার সাপেক্ষে ২৩.৫ ডিগ্রি উত্তরে এবং মকরক্রান্তি ২৩.৫ ডিগ্রি দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত (ছবি)। তোমরা জেনে খুশি হবে যে কর্কটক্রান্তি রেখাটি আমাদের বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে এবং সে কারণে বছরের নির্দিষ্ট দিনে আমরা কিছু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকি! বিষুবরেখা ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা আছে, সেগুলো সম্পর্কে তোমরা পরে জানতে পারবে।



ছবি: পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্য সেটিকে বিষুব রেখা, কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি এরকম কয়েকটি কাল্পনিক রেখায় ভাগ করা হয়েছে।

১৩.১.৪ ঋতু

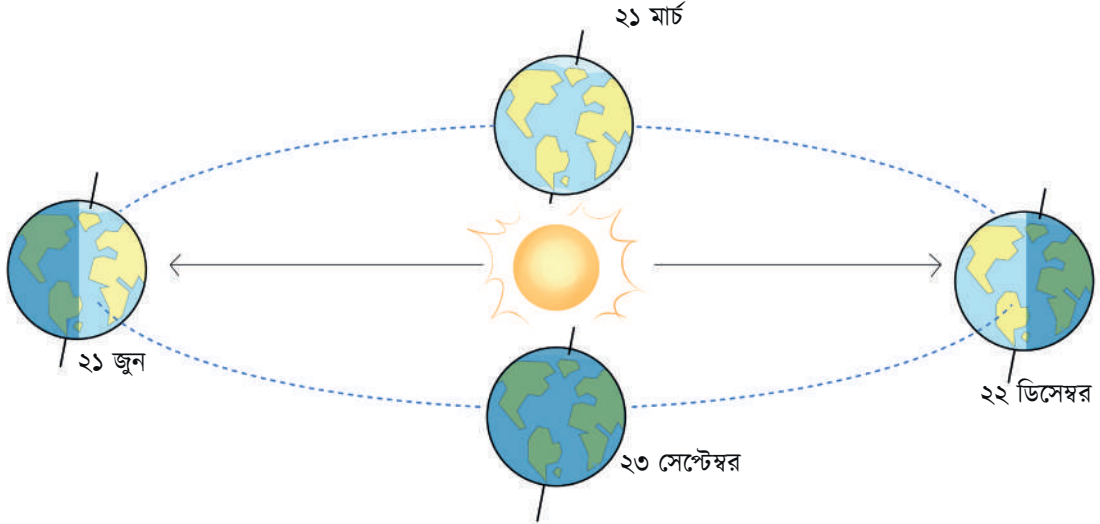
পৃথিবীর বছরের ৩৬৫ দিনকে আবহাওয়া, দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য এবং প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। বছরের এই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সময়গুলো ঋতু নামে পরিচিত। বেশিরভাগ দেশে পুরো বছরকে শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ এই চারটি ঋতুতে ভাগ করা হয়। আমাদের দেশ খুবই বিরল কয়েকটি দেশের একটি যার নিজস্ব ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জি আছে এবং সেই অনুযায়ী বাংলা মাস ব্যবহার করে পুরো বছরকে নিচের ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে।

- » গ্রীষ্ম: বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল মাঝামাঝি — জুন মাঝামাঝি)
- » বর্ষা: আষাঢ় ও শ্রাবণ (জুন মাঝামাঝি — আগস্ট মাঝামাঝি)
- » শরৎ: ভাদ্র ও আশ্বিন (আগস্ট মাঝামাঝি — অক্টোবর মাঝামাঝি)
- » হেমন্ত: কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (অক্টোবর মাঝামাঝি — ডিসেম্বর মাঝামাঝি)
- » শীত: পৌষ ও মাঘ (ডিসেম্বর মাঝামাঝি — ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি)
- » বসন্ত: ফাল্গুন ও চৈত্র (ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি — এপ্রিল মাঝামাঝি)

বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলকে বিষুবীয় অঞ্চল বলে, সেখানে সারা বছরই সূর্যের আলো মোটামুটি খাড়া ভাবে পতিত হয় বলে ঋতুর পরিবর্তন খুব ভালোভাবে অনুভূত হয় না।

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার সময় বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো পৃথিবীর বিভিন্ন

জায়গায় বিভিন্নভাবে আপতিত হয়। যেমন ২১ জুন সূর্যের আলো কর্কটক্রান্তির ওপর একেবারে খাড়াভাবে আপতিত হয়, সেই দিনটি উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে লম্বা দিন। দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার কারণে এবং খাড়াভাবে সূর্যের আলো পড়ার জন্য এই সময়টি উত্তর গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল। আবার এই সময়টিতে দক্ষিণ গোলার্ধের মকরক্রান্তি রেখার ওপর থেকে সূর্যকে দেখলে মনে হবে সেটি উত্তরদিকে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে। দিনগুলো ছোট এবং রাত দীর্ঘ। ছোট দিন এবং হেলে থাকা সূর্যের আলোর কারণে তখন দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য শীতকাল।



ছবি: ২১ জুন সূর্যের আলো কর্কট ক্রান্তির ওপর খাড়াভাবে আপতিত হয় এই সময়টি উত্তর গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য শীতকাল। ২২ ডিসেম্বর সূর্যের আলো মকর ক্রান্তির ওপর খাড়া ভাবে আপতিত হয় এবং সেটি দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধের জন্য শীতকাল।

তারপরের ছয় মাস সূর্যকে ঘিরে আবর্তন করার সময় পৃথিবীতে সূর্যের আলো কর্কটক্রান্তির ওপর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে এবং ঠিক ছয়মাস পরে ২২ ডিসেম্বর সূর্যের আলো মকরক্রান্তির ওপর ঠিক খাড়াভাবে আপতিত হয়। সেখানে দিন দীর্ঘ এবং খাড়াভাবে সূর্যের আলো থাকার কারণে সেটি দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ তখন কর্কটক্রান্তির ওপর থেকে তাকালে মনে হবে সূর্য হেলতে হেলতে দক্ষিণ দিকে সবচেয়ে বেশি ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে গেছে।

২১ জুন এবং ২২ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ ২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্যের আলো আপতিত হয় কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি রেখার ঠিক মাঝখানে, অর্থাৎ বিষুবরেখার ওপর। বুঝতেই পারছ তখন দিন এবং রাত হয় ঠিক ১২ ঘণ্টা করে। এর ফলে এই সময় ঠান্ডা ও গরমের মাঝামাঝি একটা আবহাওয়া অনুভূত হয়। প্রাচীন অনেক সভ্যতার মানুষের কাছে এই দিনগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এই দিনগুলো মেনে পালন করা হতো।

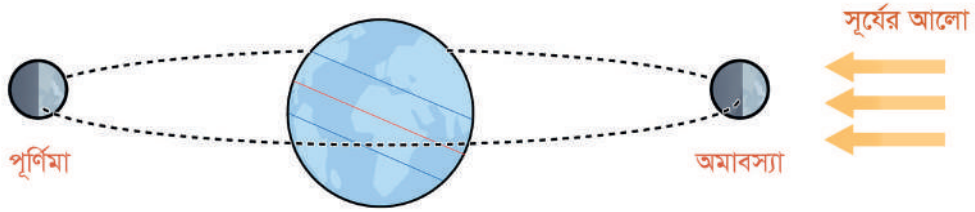
১৩.২ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন সঞ্চলে আবহাওয়ার পার্থক্য

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত বেশ ভালোভাবে অনুভূত হয়। বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার মেরু অঞ্চলের

শীতের সঙ্গে আমাদের দেশের শীতের তুলনা চলে না। মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে বছরের অনেকটা সময় শীত থাকে। এমনকি কিছু কিছু এলাকা সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। সৌদি আরবসহ উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া মূলত গ্রীষ্মপ্রধান এবং শুষ্ক। এই যে বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া বিভিন্ন রকম হয়, তা মূলত নির্ভর করে সেই এলাকার অবস্থান, জলাশয় বা পানির উপস্থিতি, উদ্ভিদের তথা বনাঞ্চলের উপস্থিতি ইত্যাদির ওপর। তবে সবকিছুর মূলে রয়েছে সৌরশক্তির (আলো এবং তাপ) কতটুকু পাওয়া যাবে তার ওপর। বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি রেখা ও তার কাছাকাছি এলাকায় সূর্যরশ্মি লম্বভাবে বা 90° কোণের কাছাকাছি কোণে পড়ে বলে সেসব এলাকায় আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে থাকে। আবার মেরু অঞ্চল এবং তার সংলগ্ন এলাকায় সূর্যরশ্মি তির্যক বা বাঁকাভাবে পড়ে বলে সেখানে উষ্ণতা কম এবং শীত বেশি হয়ে থাকে।

তবে কোনো এলাকার উচ্চতাও সেই এলাকার আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারে। যেমন উঁচু পর্বতে তাপমাত্রা একই অক্ষাংশের সমতলভূমির তাপমাত্রার তুলনায় অনেক কম হতে পারে। এর কারণ হলো, বায়ুমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা নিচের স্তরে যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, বায়ুর তাপমাত্রা তত কমতে থাকে।

১৩.৩ পৃথিবীর ওপর চাঁদের প্রভাব



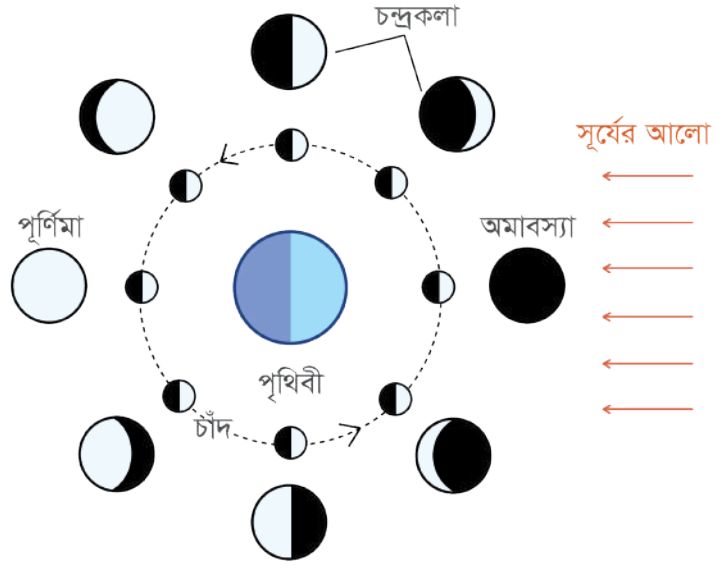
ছবি: সূর্যের আলো দিয়ে পুরো চাঁদ আলোকিত হলে আমরা পূর্ণিমা বলে থাকি। চাঁদের বিপরীত দিক আলোকিত হলে আমরা চাঁদকে দেখতে পাই না এবং আমরা সেটাকে অমাবস্যা বলি।

১৩.৩.১ চন্দ্রকলা

তোমরা সবাই আকাশে চাঁদ দেখে মুগ্ধ হয়েছ। পৃথিবীর আঙ্গিক গতির জন্য সূর্যের মতোই চাঁদ পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এক দিন থেকে পরের দিন সূর্যের আকার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আমরা চাঁদের আকৃতির পরিবর্তন হতে দেখি। পূর্ণিমার ভরা চাঁদ ক্ষীণ হতে হতে অমাবস্যায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার নতুন চাঁদ ধীরে ধীরে বড় হয়ে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়। আসলে চাঁদের আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই, সূর্যের আলো চাঁদের যে অংশে পড়ে, আমরা সেই অংশটা দেখতে পাই। এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার সময় সূর্যের সাপেক্ষে তার অবস্থানের জন্য চাঁদের আলোকিত অংশের আকার প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। চাঁদের আলোকিত অংশের এই পরিবর্তনের একটি সুন্দর নাম আছে, সেটি হচ্ছে 'চন্দ্রকলা'।

চন্দ্রকলার বিষয়টি বোঝার জন্য সূর্য এবং পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদ কোথায় আছে সেটি জানতে হয়। পৃথিবীকে ঘিরে ঘূর্ণনের সময় চাঁদ যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে থাকে, সূর্যের আলো তখন

চাঁদের পিছন দিকটি আলোকিত করে, পৃথিবী থেকে আমরা সেই আলোকিত অংশটি দেখতে পাই না বলে চাঁদ আমাদের সামনে অদৃশ্য থাকে এবং আমরা সেই সময়টাকে বলি অমাবস্যা। চাঁদটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যখন ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, তখন চাঁদের আলোকিত অংশটুকু পৃথিবী থেকে একটু একটু দেখা যেতে শুরু করে। চাঁদের আলোকিত অংশটুকু দৃশ্যমান হতে হতে যখন চাঁদ সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর পেছনে থাকে, তখন পুরো চাঁদটি দৃশ্যমান হয় এবং আমরা সেটিকে পূর্ণিমার চাঁদ বলি। চাঁদের ঘূর্ণনের কারণে আবার চাঁদের দৃশ্যমান অংশটুকু কমতে কমতে একসময় অমাবস্যায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। চাঁদের দৃশ্যমান অংশ যখন বাড়তে থাকে, সেই সময়কে বলে শুরুপক্ষ; যখন কমতে থাকে, তাকে বলে কৃষ্ণপক্ষ।



ছবি: ভেতরের বৃত্তটিতে চাঁদের প্রকৃত অবস্থান এবং তার আলোকিত অংশটি দেখানো হয়েছে। বাইরের বৃত্তটিতে পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখলে কেমন দেখাবে বা চন্দ্রকলা দেখানো হয়েছে।

চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রতি ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার পূর্ণ আবর্তন করে বা ঘুরে আসে। কিন্তু একটি নতুন চাঁদ থেকে পরের নতুন চাঁদ দেখতে সময় নেয় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা। তার কারণ চাঁদ যখন পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হয়, সেই সময়টাতে পৃথিবীটাও সূর্যকে ঘিরে খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করে আসে তাই সূর্যের সাপেক্ষে চাঁদকে একই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য একটু বেশি আবর্তিত হতে হয়।

তোমরা যারা আকাশে চাঁদকে লক্ষ করেছ তারা নিশ্চয়ই জানো আমরা সব সময়েই চাঁদের একটি পৃষ্ঠ দেখি, অন্য পৃষ্ঠটি কখনো দেখতে পাই না। তার কারণ চাঁদ এমনভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যে চাঁদের এক পাশ সব সময় পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে। সাম্প্রতিককালে চন্দ্রাভিযান করার সময় চাঁদের পেছন দিকের ছবি তুলে আনায় আমরা প্রথমবার সেটি দেখতে পেয়েছি।

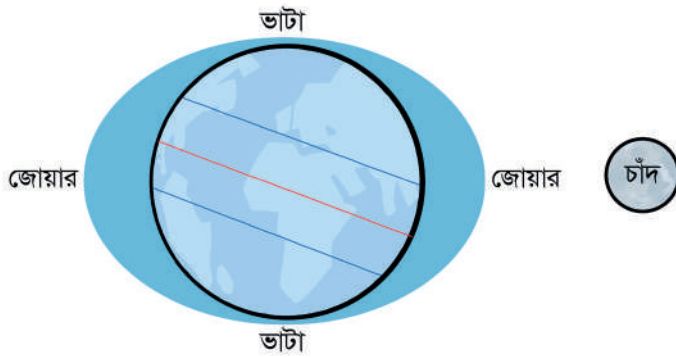


ছবি: আমরা বাম দিকে দেখানো চাঁদের পৃষ্ঠ দেখে অভ্যস্ত। মহাকাশযান দিয়ে তোলা চাঁদের বিপরীত দিকের ছবিটি ডান দিকে দেখানো হলো।



১৩.৩.২ জোয়ার ও ভাটা (tide)

তোমাদের মধ্যে যারা সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় থাকো, তারা নিশ্চয় দেখে থাকবে যে সেখানে সমুদ্র এবং নদ-নদীর পানি দিনে দুই বার করে বাড়ে এবং কমে। উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র এবং নদীর পানির স্তরের নিয়মিত এই ওঠা এবং নামাকে যথাক্রমে জোয়ার এবং ভাটা বলা হয়। তোমরা সবাই জানো, মহাকর্ষ বলের জন্য সবকিছুই অন্য সবকিছুকে আকর্ষণ করে। সেই হিসেবে সূর্য এবং চাঁদও পৃথিবীর সবকিছুকে আকর্ষণ করে। যদিও পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের আকর্ষণ থেকে অনেক বেশি, কিন্তু বিস্ময়করভাবে পৃথিবীর জোয়ার ভাটার বিষয়টি মূলত ঘটে থাকে চাঁদের আকর্ষণের জন্য। তার কারণ পৃথিবীতে মোট আকর্ষণের পরিমাণ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে চাঁদের আকর্ষণের পার্থক্য জোয়ারভাটা ঘটিয়ে থাকে। সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তার আকর্ষণের পার্থক্য কম। কিন্তু চাঁদ তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অনেক কাছের, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে চাঁদের আকর্ষণের পার্থক্য অনেক বেশি। সে জন্য চাঁদ পৃথিবীর যে অংশের ঠিক উপরে থাকে, সেই জায়গার পানিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে স্ফীত করে তোলে এবং আমরা সেটাকে বলি জোয়ার। আবার একই সময়ে



ছবি: চাঁদের আকর্ষণে যখন পৃথিবীর পানি ফুলে ওঠে তাকে জোয়ার বলে। পানি ফুলিয়ে তোলার জন্য অন্য জায়গা থেকে পানি সরে আসে এবং সেটাকে ভাটা বলে।

চাঁদের অবস্থানের একেবারে বিপরীত দিকে পানির ওপর বল সবচেয়ে কম, সেখানে বিপরীত দিকে বল কাজ করছে কল্পনা করা যায়, তাই সেখানেও উলটো দিকে পানি স্ফীত হয়ে জোয়ার হয়। একই সময়ে দুই পাশে পানির স্তর স্ফীত করার জন্য যে অংশের পানির স্তর নেমে যায় তাকে ভাটা বলে। জোয়ারের মতো সেই স্থানের একেবারে উল্টোদিকেও একই সঙ্গে ভাটা

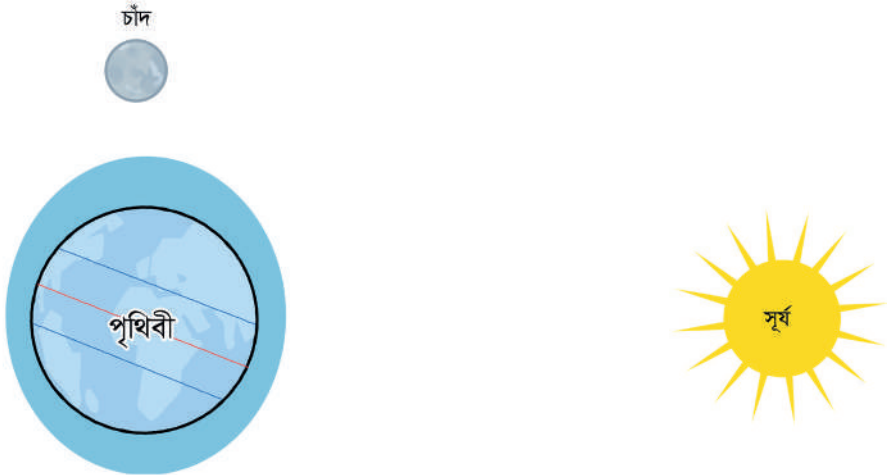
হয়। অর্থাৎ এক দিনে চারবার সাগর, মহাসাগর এবং উপকূলবর্তী এলাকার নদ-নদীর পানি ওঠানামা করে। সেই ক্ষেত্রে ছয় ঘণ্টা পর পর জোয়ার-ভাটা হওয়ার কথা, কিন্তু আমাদের যেহেতু চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং সময়ের সাথে সাথে চাঁদের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে সেজন্য ছয় ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পর জোয়ার-ভাটা হয়।

যদিও জোয়ার ও ভাটা মূলত চাঁদের কারণে হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে সূর্যের অবস্থানেরও একটু ভূমিকা আছে। যখন চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্য এক সরলরেখায় অবস্থান করে, তখন জোয়ারের পানি একটু বেশি ফুলে ওঠে এবং ভাটার পানি বেশি নেমে যায়। কারণ এক্ষেত্রে সূর্য এবং চাঁদের আকর্ষণ বল একই সরলরেখায় কাজ করে বলে পানি বেশি আকর্ষিত হয়। এই অবস্থাকে ভরা কটাল বলে। প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় ভরা কটাল হয়।

আবার যখন সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ সমকোণে অবস্থান করে, তখন সূর্যের অবস্থানের কারণে পানির স্তর কিছুটা সূর্যের দিকে ফুলে উঠে। এ জন্য জোয়ারের পানি কিছুটা কম উঁচুতে ওঠে এবং ভাটার পানি কিছুটা কম নামে। অর্থাৎ জোয়ার ভাটার তীব্রতা কমে যায়। এই অবস্থাকে মরা কটাল বলে।



ছবি: অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে যখন সূর্য আর চাঁদ একই সরল রেখায় থাকে, তখন জোয়ার এবং ভাটার তীব্রতা বেশি হয় এবং সেটাকে ভরা কটাল বলে।



ছবি: যখন সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ সমকোণে অবস্থান করে, তখন সূর্যের অবস্থানের কারণে পানির স্তর কিছুটা সূর্যের দিকে ফুলে উঠে। এ জন্য জোয়ার ভাটার তীব্রতা কমে যায় এবং এই অবস্থাকে মরা কটাল বলে।

১৩.৪ সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থান

সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে জোয়ার-ভাটা, চন্দ্রকলা ছাড়াও আরও দুটি ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো হলো সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ।

১৩.৪.১ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

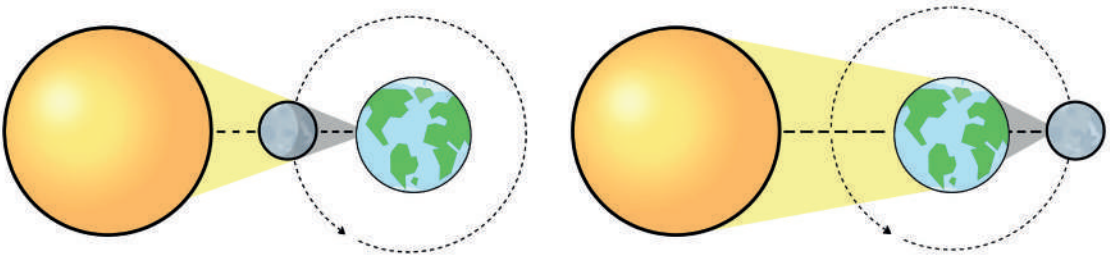


ছবি: সূর্যগ্রহণ

যেহেতু সূর্যগ্রহণ খুব বেশি হয় না, তাই সম্ভবত তোমরা সূর্যগ্রহণ খুব বেশি দেখার সুযোগ পাওনি, কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়ই কখনও না কখনও পূর্ণ কিংবা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পূর্ণিমার ভরা চাঁদ হঠাৎ একটা গোলাকৃতি ছায়ায় ঢেকে যেতে থাকে। পূর্ণ নাকি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ তার ওপর নির্ভর করে পুরো কিংবা আংশিক চাঁদ ঢেকে যায়। আবার সূর্যগ্রহণ হয় অমাবস্যার সময়, তখন সূর্যটা একটা বৃত্তাকার ছায়ায় ঢেকে যেতে থাকে। অনেক সময় দিনের বেলায় অন্ধকার নেমে একটা রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কাজেই এটা মোটেও বিচিত্র কিছু নয় যে প্রাচীনকালে মানুষ যখন চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের সময় আসলে কী হয় সেটি জানত না, তাই তারা নানা ধরনের বিচিত্র কুসংস্কার দিয়ে তারা বিচিত্র গল্প তৈরি করত!

এখন আমরা জানি বিষয়টি আসলে খুবই সহজ, চাঁদ যেহেতু পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে, তাই ঘুরতে ঘুরতে প্রতি অমাবস্যাতেই এটি সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে। ঘটনা ক্রমে যদি পৃথিবী চাঁদ এবং সূর্য একই সরল রেখায় হাজির হয়, তখন চাঁদের কারণে সূর্যটা ঢাকা পড়ে এবং এই ঘটনাকে সূর্যগ্রহণ বলে। যদি সূর্য চাঁদের দ্বারা পুরোপুরি ঢেকে যায়, তবে তাকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বলে। যদি চাঁদের দ্বারা সূর্য আংশিক ঢাকা পড়ে অর্থাৎ চাঁদের আংশিক ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, তখন আংশিক সূর্যগ্রহণ হয়।

ঠিক একইভাবে চাঁদ প্রতি পূর্ণিমাতে পৃথিবীর পেছনে উপস্থিত হয় এবং তখন যদি ঘটনাক্রমে চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্য একই সরলরেখায় চলে আসে, তখন চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে এবং আমরা সেটাকে চন্দ্রগ্রহণ বলি। যদি চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় পুরোপুরি ঢেকে যায়, তবে তাকে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বলে। যদি



(ক)

(খ)

ছবি: (ক) চাঁদ যখন অমাবস্যায় সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে, তখন সূর্য ঢাকা পড়ে যায় যেটাকে আমরা বলি সূর্যগ্রহণ (খ) পূর্ণিমার রাতে চাঁদে যখন পৃথিবীর ছায়া পড়ে, আমরা সেটাকে বলি চন্দ্রগ্রহণ

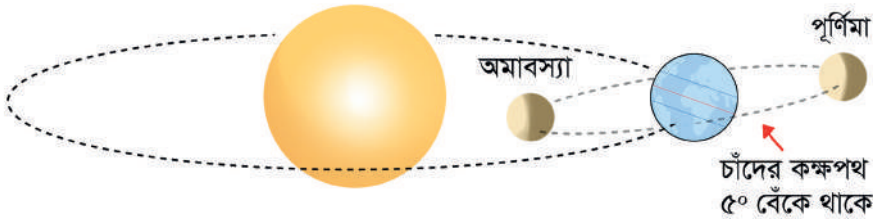


ছবি: পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়

পৃথিবীর ছায়ার দ্বারা চাঁদ আংশিক ঢাকা পড়ে অর্থাৎ পৃথিবীর আংশিক ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে, তখন আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হয়।

তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে কেন প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ হয় না? চাঁদ যদি পৃথিবীর কক্ষপথের একই তলে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করত, তাহলে প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দেখা যেত। কিন্তু চাঁদ যেহেতু পৃথিবীর সাপেক্ষে ৫ ডিগ্রি কোণে প্রদক্ষিণ করে, তাই সেটি প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে সূর্য আর পৃথিবীকে সংযুক্ত করে সরলরেখায় উপস্থিত হতে পারে না। তবে আগে থেকে হিসাব করে আমরা কবে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হবে

সেটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। ১৫০৩ সালের ৩০ জুন ক্রিস্টোফার কলম্বাস জামাইকার সরলপ্রাণ আদিবাসী মানুষদের চন্দ্রগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করে সেটিকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে ভয় দেখিয়ে তাদের প্রতারণা করে নিজেদের খাদ্য এবং রসদের ব্যবস্থা করেছিলেন।



ছবি: চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের তুলনায় ৫ ডিগ্রি কোণে বেঁকে থাকে

সন্ধাননী ?

- ১। আকাশে চাঁদ দেখে কি তুমি বলতে পারবে, চাঁদটি কি শুক্লপক্ষের চাঁদ নাকি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ?
- ২। ককটক্রান্তি রেখাটি বাংলাদেশের কোন এলাকার উপর দিয়ে গিয়েছে সেটি কি তোমরা বের করতে পারবে?
- ৩। তোমাদের বাসার ছাদে যদি সোলার প্যানেল লাগাতে চাও তাহলে সেটি কোন দিকে মুখ করে থাকতে হবে এবং কেন?



অধ্যায় ১৪

জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
এবং টেকসই পরিবেশ

জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং টেকসই পরিবেশ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ☑ পরিবেশের প্রাণী ও উদ্ভিদ ও অণুজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
- ☑ মানুষের জীবনে অণুজীবের ব্যবহার ও উপযোগিতা
- ☑ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জীবজগতের সংকট
- ☑ বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর এর প্রভাব

সাদাচোখে আমরা যেমন জীব আর জড়কে আলাদা করে দেখি, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় বিষয়টা অত সরল নয়। আমরা যাদের জীব বলি, যারা চলতে ফিরতে পারে, খাবার গ্রহণ করে, তাদের গঠন খেয়াল করলেও দেখবে—বিভিন্ন অজৈব অণু অর্থাৎ জড় উপাদান দিয়েই তারা তৈরি! আবার জীবের সংজ্ঞাও সব সময় অত স্পষ্ট নয়। যেমন—ভাইরাসের দিকে যদি তাকাও, ভাইরাসকে জীব বা জড়ের কাতারে ফেলা খুব মুশকিল, কারণ পোষক দেহে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ভাইরাসের আচরণ যা দেখা যায় তাতে তাকে জড় বলাই বেশি সংগত। ঠিক কীভাবে অসংখ্য জড় উপাদান একত্র হয়ে জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই, বিজ্ঞানীরা তাই দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে গবেষণা করছেন। তোমরা উপরের শ্রেণিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও অনেক বিস্তারিত জানতে পারবে!



জীবজগৎ এবং জড় উপাদানের সম্পর্কটি একটি চক্রের মতো। যখন নতুন জীব জন্ম নেয়, তখন সেই জীবের শরীরে পরিবেশের বিভিন্ন উৎস থেকে জৈব এবং অজৈব উপাদান সঞ্চিত হয়। এই জীবটি যখন মারা যায়, তখন আবার সেই জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলো পরিবেশে ফিরে যায়। পরবর্তীকালে আবার কোনো জীবের ভেতর সঞ্চয়ের আগ পর্যন্ত তারা পরিবেশে জৈব এবং জড় উপাদান হিসেবে বিরাজ করতে থাকে।

কোনো একটি অঞ্চলের জীবজগৎ এবং সেই পরিবেশের সকল জড় উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে যে সিস্টেম গড়ে ওঠে, তাকে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম বলা হয়।



ইকোসিস্টেম সাধারণত একটি অঞ্চলভিত্তিক হয়। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি প্রত্যেক ইকোসিস্টেমের দুই ধরনের উপাদান রয়েছে—জীবজ উপাদান এবং জড় উপাদান।

জীবজ উপাদানের ভেতরে রয়েছে বিভিন্ন অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী। আর জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, আলো, পানি, অক্সিজেন, মাটি ইত্যাদি।

১৪.১ জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এই জীবজগতের অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী সবাই একে অপরের ওপর নির্ভর করে। অণুজীব সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের মনে হতে পারে তারা বৃষ্টি আমাদের নানান রোগব্যাধি তৈরি করে কেবল আমাদের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু অনেক অণুজীব রয়েছে যারা আমাদের উপকার করে। যেমন—

দইয়ের সঙ্গে আমরা যেসব ব্যাকটেরিয়া খাই তারা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী। আমাদের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ অ্যান্টিবায়োটিকের উৎস হচ্ছে কিছু ছত্রাক (fungi)। ভাইরাস ব্যবহার করে আমরা প্রাণঘাতী নানান অসুখের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করি। যেমন—পোলিও অসুখটির কথা হয়তো তোমরা শুনে থাকবে। এই অসুখ হলে আমাদের ন্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আমরা পঙ্গুত্ব বরণ করি। এই রোগের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করা হয় ভাইরাস ব্যবহার করে।



অণুজীব উদ্ভিদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে

যারা উদ্ভিদকে পরিবেশ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে সহায়তা করে। বিজ্ঞানীরা পাটের পাতা এবং কাণ্ডেও বিভিন্ন ধরনের অণুজীব পেয়েছেন যারা পাটের বৃদ্ধি ও টিকে থাকার জন্য সহযোগিতা করে।

উদ্ভিদের ওপর সমগ্র জীবজগৎ নির্ভর করে। কারণ, আমরা জানি যে, সব সবুজ উদ্ভিদই নিজেরা সূর্যের আলো ব্যবহার করে শর্করা উৎপাদন করে। এই শর্করায় জমা হওয়া শক্তি পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জৈব অণুতে প্রবাহিত হয়। এভাবে সূর্য থেকে আসা আলোকশক্তি বিভিন্ন রূপে অন্যান্য জীবে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের কাছ থেকেই পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে অণুজীব। এ ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদেরকে পচন করিয়ে প্রকৃতিতে বিভিন্ন উপাদান ফিরিয়ে দেয় এই অণুজীবেরা।

প্রকৃতিতে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের মধ্যকার পুষ্টির এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে খাদ্যচক্র (food cycle) বলে। এই চক্রের মূল বিষয় হচ্ছে—প্রকৃতিতে এক জীব আরেক জীবের খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে। পৃথিবীর খাদ্যচক্রে মানুষের অবস্থান একেবারে উপরের দিকে এবং তাদের খাদ্যাভ্যাস ও এই সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিবেশের অন্যান্য জীবের ওপর বড় রকমের প্রভাব ফেলে।



১৪.২ পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে মানুষের ভূমিকা

পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে (ecosystem) মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যেহেতু খাদ্যচক্রের সর্বোচ্চ স্তরের খাদক ও প্রভাব বিস্তারকারী, তাই তার আচরণের প্রভাব জীবজগতের সকলের ওপর পড়ে। বাস্তুতন্ত্রের কেবল জীব উপাদানই নয় বরং জড় উপাদানের ওপরও মানুষের প্রভাব রয়েছে। মানুষ এখন আশুনা, পানি, বাতাসসহ পরিবেশ ও আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানে প্রভাব ফেলছে। তারা কৃষির শিল্পায়ন করছে এবং পরিবহনের জন্য নানান যানবাহন, রাস্তাঘাট, সৌর প্যানেল ইত্যাদি তৈরি করছে। এর ফলে পরিবেশের ওপর দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বড় কৃষিখামার তৈরির জন্য যখন আমরা ছোট বড় পাহাড়, জলাভূমি ইত্যাদি একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করি তখন আমরা সেই স্থানের বাস্তুতন্ত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে ফেলি। কখনও কখনও, আমরা এমনকি একটি

বাস্তুতন্ত্রকে মূল ভিত্তি থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাই।

যখন কোনো বনের গাছ কাটা হয়, তখন বনভূমির বাস্তুতন্ত্র পরিবর্তিত হয়। কারণ, বনের ওপর নির্ভরশীল প্রজাতিগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য নতুন করে চেষ্টা করতে হয় এবং স্থানীয় আর্দ্রতা এবং জলবায়ু উভয়ই পরিবর্তিত হয়। আবার, একটি বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর গতিপথ এবং পানির বণ্টনও পরিবর্তিত হয় এবং নদীর গতিপথ বরাবর বসবাসকারী প্রজাতিগুলো প্রভাবিত হয়।

এভাবেই মানুষের নানান কর্মকাণ্ড আমাদের পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে, কাজেই এই মুহূর্তে মানুষের একটি বড় দায়িত্ব এই পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

পরিবেশ দুভাবে সংরক্ষণ করা হয়। একটি উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য সেসব সম্পদের ঘাটতি না হয়। যেমন—এখন কোনো কৃষক তার জমি চাষ করে ফসল ফলাচ্ছেন। এর ফলে জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। যদি তিনি এমনভাবে কৃষিকাজ করেন যেন জমির উর্বরতা আবার আগের মতো হয়ে যায় এবং পরবর্তী বংশধরেরা ভবিষ্যতে চাষবাস করে তাঁরই মতো ফসল ফলাতে পারে, তাহলে জমির মাটি বা পরিবেশ সংরক্ষণ হচ্ছে বলা যায়।

আবার বিশেষ ক্ষেত্রে যখন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্তির পথে যায় তখন সেগুলো আরও গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো জীব বা প্রাকৃতিক সম্পদ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সংরক্ষণ করা হয় এবং তা ব্যবহার থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয়। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে যেগুলো মানুষের খাদ্য এবং ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। যদি তাদের সংখ্যা বেশি পরিমাণে কমে যায় তখন তাদেরকে এইভাবে রক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে সেসব উদ্ভিদ, প্রাণী বা প্রাকৃতিক সম্পদ কেউ ব্যবহার করতে পারবে না এবং সেটি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই সংরক্ষণ করতে হবে।



১৪.২.১ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

অবাস্তব বা অব্যবহারযোগ্য বস্তুগুলোকে বর্জ্য বলা হয়। কোনো বস্তু যখন আর ব্যবহারের উপযোগী থাকে না, অনাকাঙ্ক্ষিত স্থান দখল করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে তখন সেই সব বস্তু বর্জ্য হিসেবে গণ্য হয়। যেমন আমরা বাসায় যে কাচ, সিরামিক বা মেলামাইনের থালা, বাটি, গ্লাস ব্যবহার করি সেগুলো যদি ভেঙে যায় তাহলে বর্জ্য বা আবর্জনায় পরিণত হয়। এগুলো হচ্ছে কঠিন বর্জ্য। বাসার ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যদি নষ্ট হয়ে যায়

ছবি: আবর্জনা ফেলার সময় পচনশীল, অপচনশীল, ঝাঁকিপূর্ণ, ই-বর্জ্য ইত্যাদি ধরন অনুযায়ী আলাদা করে ফেললে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। এই কারণে হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট ধরনের আবর্জনা ফেলার জন্য আলাদা আলাদা রংয়ের ডাস্টবিন রাখা থাকে

এবং মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তাহলে সেগুলো ইলেকট্রনিক বা ই-বর্জ্য পরিণত হয়। রান্নার জন্য তরিতরকারি কাটার পর ব্যবহার অযোগ্য যে সকল অংশ ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলোও বর্জ্য। তবে সেগুলো পচনশীল এবং তা পচিয়ে জৈব সার উৎপন্ন করা যায়। আবার হাসপাতালে ব্যবহৃত গজ, ব্যান্ডেজ, অস্ত্রোপচারের পর ফেলে দেওয়া দেহের বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জৈব বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এগুলোকে মেডিকেল বর্জ্য বলা হয় এবং এগুলো সবচেয়ে ক্ষতিকর বর্জ্যের মধ্যে অন্যতম। আমরা চকলেট, বিস্কুট, বা চিপস খাওয়ার পর যে প্যাকেট ফেলে দিই তা অপচনশীল বর্জ্য এবং পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এজন্য এগুলো যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়।

বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী সেগুলোর ব্যবস্থা করার পদ্ধতি হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। যেমন—পচনশীল বর্জ্যগুলো পচিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যেতে পারে যা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। কাচ বা ধাতব বর্জ্য গলিয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য নতুন দ্রব্য তৈরি করা যেতে পারে। এমন কিছু বর্জ্য আছে যেগুলো মানুষ জীবের জন্য এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয় অথবা মাটির নিচে এমনভাবে চাপা দিয়ে রাখা হয় যেন কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। তবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটা মনে চলতে হয়, তা হচ্ছে যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।

১৪.২.২ সম্পদের অপচয় রোধ এবং টেকসই ব্যবহার

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য যেসব সম্পদ ব্যবহার করি, তা অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত। তাই দীর্ঘদিন সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য রাখতে হলে সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমরা যেসব সম্পদ ব্যবহার করি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাটি, পানি, বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি এবং খাদ্যদ্রব্য।

মাটি এমন একটি সম্পদ যা না হলে আমরা আমাদের কৃষিজ উৎপাদন করতে পারতাম না। এই মাটিও কিন্তু সীমিত সম্পদ। কোনো জমিতে একটানা কয়েক বছর একই ধরনের ফসল চাষ করলে সেই জমির উর্বরতা কমে যায়। কারণ, একেক ধরনের ফসলের জন্য মাটির একেক ধরনের খনিজ উপাদান বেশি দরকার হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে খনিজ উপাদান মাটিতে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগে। একটানা একই ধরনের ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতা পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসার সময় পায় না। ফলে ফসল উৎপাদনও কমে যায়। এমনকি অব্যবহৃত জমির ওপরে ঘাস বা অন্য গাছপালার আবরণ না থাকলে উপরের স্তরের উর্বর মাটি (top Soil) ক্ষয় হয়ে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়।

বিভিন্ন জীবের শরীরের একটি বড় অংশই হচ্ছে পানি। পানি না থাকলে উদ্ভিদ প্রাণী কোনো কিছুই বেঁচে থাকতে পারবে না। পৃথিবীর বিপুল জলরাশির মধ্যে খুব সামান্য অংশ আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার কারণে প্রচুর পানি অপচয় হয় এবং এর ফলাফলস্বরূপ দরকারের সময় আমরা পানি থেকে বঞ্চিত হতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন কাজে যতটুকু পানি দরকার, ঠিক ততটুকুই আমাদের ব্যবহার করা উচিত। গোসল করা,





ছবি: গাইবান্ধায় নবমিনির্নিত সৌরবিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র

গাড়ি ধোয়া, বাগান বা জমিতে পানি দেওয়া, বাথরুম ব্যবহারের সময় সঠিক মাত্রায় পানি ব্যবহার করা উচিত।

বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার করে আমরা শক্তি উৎপাদন করি। জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে রয়েছে কাঠ, কয়লা, জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। এসব জ্বালানি একবার ব্যবহার

হয়ে গেলে পুনরায় ব্যবহার করার উপায় থাকে না। এজন্য এগুলোকে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি বলা হয়। এজন্য এসব জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় পরিহার করা উচিত। তবে বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি ইত্যাদি বারবার ব্যবহার উপযোগী এবং এগুলোকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলা হয়। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারলে বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব।

যেকোনো জীবের বেঁচে থাকার জন্য পানির সঙ্গে খাদ্যও দরকার। পৃথিবীর অনেক স্থানেই মানুষ দৈনিক তিনবেলা খাদ্য জোগাড় করতে পারে না। খাদ্য উৎপাদন করতে জ্বালানিসহ অন্যান্য সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফসল ফলাতে মাটির উর্বরতা ব্যবহৃত হয়, জমিতে সেচ কাজে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে জীবাশ্ম জ্বালানি কিংবা বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ফসল বা অন্য খাদ্যদ্রব্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে যে যানবাহন ব্যবহৃত হয় তাতে অনেক ক্ষেত্রেই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হয়। তাই খাদ্যদ্রব্য অপচয় করা মানে অন্যান্য সম্পদেরও অপচয় করা। আমরা যদি সকল প্রকার সম্পদের অপচয় রোধ করতে পারি তবেই একটি সুখি, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।



ছবি: কক্সবাজারে উইন্ড টারবাইন ব্যবহার করে বায়ুশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে

১৪.৩ বাংলাদেশের জলবায়ু সংকট ও আমাদের করণীয়

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের বাংলাদেশেও পড়েছে। আমাদের দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানীদের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারব, ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে তারা আগে ছয়টি ঋতুর পার্থক্য বুঝতে পারতেন। দেশের কৃষিকাজের জন্য কৃষকরা এই জলবায়ু এবং ঋতুর পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতেন। কিন্তু এখন ঋতু পরিবর্তনের সেই নিয়মে খানিকটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন—বাংলা ক্যালেন্ডারের আষাঢ়, শ্রাবণ এই দুই মাসকে বর্ষাকাল হিসেবে বলা হলেও এখন আশ্বিন মাসেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা অসময়ের বন্যা ডেকে আনে। আবার আগে শীতকালে যতটা শীত অনুভূত হতো, এখন তেমনটা দেখা যায় না। আবহাওয়া ও জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে দেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদির প্রকোপ বেড়েছে।

বাংলাদেশে ‘সিডর’ নামে একটি বড় সাইক্লোন আঘাত হেনেছিল ২০০৭ সালের ১১ নভেম্বর। সেই সময়ে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি স্থলভাগের কৃষিজমি, মানুষের বাসস্থানকে প্লাবিত করেছিল। তারপর থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ফসলি জমি, পুকুর, বাসস্থান ইত্যাদি লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি উৎপাদন কমে গেছে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন, এই প্রবণতা আরও বাড়তে থাকবে। স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক অঞ্চল পানির নিচে চলে যেতে পারে। এমনকি আমাদের সুন্দরবনের একটি অংশও স্থায়ী প্লাবনের শিকার হয়ে এখনকার জীবজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

দক্ষিণাঞ্চলে যেমন আমরা লবণাক্ততার সম্মুখীন হচ্ছি, অপরদিকে আমাদের উত্তরাঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণে খরার প্রকোপ বাড়ছে। ফলে এখানেও কৃষি উৎপাদন কমবে এবং জীববৈচিত্র্যে পরিবর্তন আসবে। আমাদের বাংলাদেশের অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এর মাঝে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।





ছবি: সুমাত্রা গণ্ডার, একসময় বাংলাদেশে দেখা যেত। গোটা পৃথিবীতেই এরা এখন বিপন্ন।



ছবি: নীলগাই যা একসময় দিনাজপুর-পঞ্চগড় এলাকায় বিচরণ করত



ছবি: ডোরাকাটা হায়না, একসময় রাজশাহী অঞ্চলে দেখা যেত

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রাজশাহী অঞ্চলে ডোরাকাটা হায়না, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে ধূসর নেকড়ে, দিনাজপুর-পঞ্চগড় এলাকায় নীলগাই, চট্টগ্রাম ও সিলেটে বান্টিং বা বনগরু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একসময় বনমহিষ দেশের সব বনাঞ্চলেই দেখা যেত। এ ছাড়া তিন ধরনের গণ্ডার ছিল বাংলাদেশে—সুমাত্রা গণ্ডার, জাভা গণ্ডার ও ভারতীয় গণ্ডার। বাদা বা জলার হরিণকে স্থানীয়ভাবে বলা হতো বারো শিঙা হরিণ যা সিলেট ও হাওর এলাকায় দেখা যেত। কৃষ্ণঘাঁড় নামে একটি প্রাণী পাওয়া যেত রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকায়। এদের সবই এখন বিলুপ্ত।

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাওয়া দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয় একটি দেশ।



জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি একটি বৈশ্বিক সংকট। পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলোর শিল্প-প্রযুক্তিগত কারণে এই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। কিন্তু আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পরিবেশ সংক্ষণের ব্যাপারে কাজ করতে হবে। একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নিজেদের আচরণের দিক খেয়াল রাখা। অপ্রয়োজনে পৃথিবীর সম্পদের অপচয় না করে আমরা অবদান রাখতে পারি। পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার কমাতে পারি। আমরা ব্যক্তিগতভাবে পানির অপচয় কমাতে পারি, গ্যাসের অপচয় রোধ করতে পারি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবী কেবল আমাদের একার নয়। আমরা মানুষ একটি প্রজাতি মাত্র। এখানে আরও জানা অজানা লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব রয়েছে। তাদের সবার উপস্থিতি আমাদের পৃথিবীর ভারসাম্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই সময়ে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সকল জীব ও জড়জগতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার এবং আমাদের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীকে সবার জন্য বাসযোগ্য করা।

সম্ভাবনা ?

১। তোমার বাসায় সম্পদের অপচয় রোধ করতে কী কী করা যেতে পারে ভেবে দেখো তো?

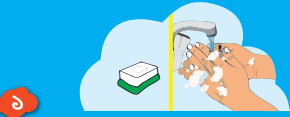
২। তোমার এলাকায় যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণী বিপন্ন তাদের খুঁজে বের করতে পারবে? তাদের বিলুপ্তি ঠেকাতে কী করা যায় চিন্তা করে দেখো।





করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব রোধে জনসচেতনতা মূলক তথ্যাবলি

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি রোধে করণীয়



১ ঘন ঘন দুই হাত সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবৎ পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।



২ যেখানে সেখানে কফ ও খুত ফেলবেন না। হাত দিয়ে নাক, মুখ ও চোখ স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন।



স্বাসকষ্ট

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)
এর লক্ষণসমূহ

৩ হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনামুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন ও হাত পরিষ্কার করুন।



২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ শ্রেণি বিজ্ঞান | অনুসন্ধানী পাঠ

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী হওয়া ভালো

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে

১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য